বৃষ্টি, তোমার জন্য

সুমন্ত আসলাম

সম্ভবত এবারও আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। বছরের একটা সময় আমি এমন হয়ে যাই, সেটা শীতের সময়। ছয় বছর ধরে আমার এমন হচ্ছে। এর কিছু কারণ আছে। সেটা আর কেউ জানে না, কেবল আমার ছোট বোন নিতু জানে।

মাঝে মাঝেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি লক্ষ করেছি এই মন খারাপ থাকা সময়টাতে পুষি আমার ঘরে আসে। এই উচ্ছল মেয়েটা আমার কাছে এসে আসলে কি চায়, আমি বুঝতে পারি না। আমার মন খারাপ হয়ে যায় আরো।

আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় একটা মিটিং আছে। কারণ মা হাসপাতালে। জরুরি একটা মিটিং হবে আজ। সবাই থাকবে সে মিটিংয়ে। মিটিংটা এক সময় শেষও হয়ে যায়, আমি আবার অস্বাভাবিক হয়ে পড়ি, আবার পাগল হয়ে যাই। মাকে নিয়ে এত নিষ্ঠুর মিটিং কেউ কখনো করেছে কি না আমার জানা নেই!

খুব সাধারণ একটা মাকে নিয়ে এই উপন্যাস, সে মা আসলে অসাধারণ, যে মা সব সন্তানের ভাগ্যে হয় না, কেবল কারো কারো ভাগ্যে হয়। আপনি কি সেই ভাগ্যবান ?

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

বৃষ্টি, তোমার জন্য

সুমন্ত আসলাম

৪৫৩৮

অন্যপ্রকাশ

চতুর্থ মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৮
তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৮
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৮

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সিঙ্গাপুর পরিবেশক | শহীদ ট্রাভেল্‌স এন্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল
শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩

Bristi, Tomar Janya | Sumanto Aslam

Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 100.00 only

ISBN : 984 868 478 6

স্পষ্টভাবে কথা বলতে তিনি ভালোবাসেন, শুনতেও ভালো লাগে। কেবল কপট মানুষগুলো এড়িয়ে চলে তাঁকে, পাছে সত্য কথা শুনতে হয়!

কবিতাও তিনি ভালো লেখেন। পত্রিকায় মাঝে মাঝে তার যে কবিতা বের হয়, বেশ অন্যরকম মনে হয় সেগুলো, পড়তেও অন্যরকম। তাঁর প্রিয় বিষয় অন্ধকার ও নৈঃশব্দ। কারণ অন্ধকারের ভেতরে আলো জ্বালানো যায়, আর নৈঃশব্দের ভেতরে সৃষ্টি করা যায় শব্দ।

কী অদ্ভুত! সারাজীবন মনে রাখার মতো একটা কথা।

প্রিয় আলফ্রেড খোকন, প্রিয় আলফ্রেড

স্পষ্টবক্তা তাঁরাই, যাঁদের আত্মা কলুষিত নয়; হৃদয় যাঁদের মরিচাময় নয়; যাঁরা কেবল কাদামাটি ভালোবেসে ফুল ফোটায়। আপনার ফোটানো ফুল দিয়ে আমরা একদিন মালা গাঁথব বন্ধু!

ভূমিকা

মা নিয়ে অনেকেই অনেক রকম উপন্যাস লিখেছেন। আগামীতে আরো লেখা হবে। অনেকদিন আগে একটা মায়ের গল্প শুনেছিলাম— অন্যরকম, ভয়াবহ, হৃদয়কাঁপানো। গল্পটা মাথার ভেতর ঘুরছিল সেই তখন থেকেই। এবার সেই মাকে সামনে রেখে একটা কিছু লেখার চেষ্টা করেছি।

আমাদের এই মা খুব সাধারণ, কিন্তু অসাধারণ তার জীবনদর্শন; আমাদের এই মা নিতান্তই আটপৌড়ে, কিন্তু অতি আধুনিক তিনি; আমাদের এই মা সবসময় হাসেন, কিন্তু তিনি আমাদের কাঁদিয়ে যান অবলীলায়। আমাদের এই মায়ের কাছে অতি ক্ষুদ্র আমরা, তাঁর ছায়ার চেয়েও আমরা তুচ্ছ।

যারা মাকে ভালোবাসেন, যারা বাসেন না— সবার কাছেই তিনি একজন আদর্শ মা। এমনতর মা চাই, আর কিছু না, আর কিছু না।

সুমন্ত আসলাম
sumanto_aslam@yahoo.com

সম্ভবত এবারও আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। বছরের এই সময়টা এলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই। আমার ভেতরে কী একটা কাজ করে, চারপাশের সবকিছু পাল্টে যায়, আমি হয়ে যাই অন্যরকম। যদিও সেটা বেশি দিনের জন্য না, দু'এক দিনের জন্য, কখনো কখনো দু'এক ঘণ্টার জন্য। তবু সারা বছরই আড়ালে-আবডালে আমাকে পাগল বলে অনেকে।

আমার এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, শীতের দিনে। তারপর থেকে প্রতিবছর শীত এলেই আমি এরকম হয়ে যাই। কেন হয়ে যাই, তা ভেবে বের করার চেষ্টা করেছি, দু'একটা কারণ অবশ্য বেরও করেছি। কিন্তু কাউকে বলি নি সেটা। নিতু অবশ্য ছিটেফোঁটা কিছু জানে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসতেই মাথাটা ঘুরে ওঠে আজও। ভাবলাম, প্রচণ্ড শীতের জন্য এরকম হচ্ছে। ভালো করে অনেকগুলো গরম পোশাক পরে নিলাম গায়ে। হাত-মোজা পরলাম, কান ঢাকা উলের টুপি পরলাম মাথায়, বাবার একটা পশমের পা-মোজা ছিল সেটা পরলাম, কম্বলের মতো মোটা কাপড়ের একটা ট্রাওজার আছে আমার, পরে নিলাম সেটাও। আমার ভেতরে শীত ঢোকা তো এখন দূরের কথা, আমাকে দেখেই নিরুৎসাহী হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা শীতের।

ঘর থেকে বের হয়ে পুকুরপাড়ে যাচ্ছিলাম। নিতু আমাকে দেখে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'ছোট ভাইয়া, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?'

থমকে দাঁড়ালাম আমি। ওর চেয়েও চোখ দুটো বড় বড় করে বললাম, 'আমি তো পাগলই। তা এ কথা বলছিস কেন?'

'এত কিছু পরেছিস কেন তুই!'

'কেন, প্রচণ্ড শীত পড়েছে, পরব না!'

'কই প্রচণ্ড শীত পড়েছে!'

'আমার তো শীত লাগছে।'

'শীত আমাদেরও লাগছে, তবে তুই সারা গায়ে যা পরেছিস সেরকম কোনো শীত পড়ে নি এখনো।' নিতু আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'মাথাটা নিচু করত দেখি।'

'কেন ?'

'তুই যে পরিমাণ লম্বা হয়েছিস, তোর মাথা ছুঁতে মই লাগবে। দেখি, জ্বর-টর এলো কি না তোর।'

'না জ্বর-টর আসে নি।'

'দেখি না তবু। নিজের গায়ে জ্বর আসলে অনেকেই টের পায় না, তুই তো আরো টের পাবি না।' নিতু হাসতে হাসতে বলে।

নিতুর হাসিতে বিভ্রান্ত হয়ে যাই আমি। মাথাটা নিচু করে ফেলি। নিতু আমার কপালে হাত রেখে বলে, 'কই, কোনো জ্বর-টর দেখছি না তো।'

'বললাম না কোনো জ্বর নেই।'

'শীতও তো তেমন নেই, তাহলে দুনিয়ার এত গরম কাপড় গায়ে চড়িয়েছিস কেন ? তোর গায়ের কাপড়-চোপড় দেখে আমার নিজেরই গরম লাগছে।' নিতু কপাল কুঁচকে চলে যায়।

আমি আবার বিভ্রান্ত হয়ে যাই। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াই। পুকরের টলটলে পানি দেখে হঠাৎ আমার গোসল করতে ইচ্ছে করে। পরক্ষণেই আমি টের পাই কেমন যেন গরম লাগছে আমার। একটু একটু করে ঘামছি আমি। মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। সবকিছু দুলতে থাকে আমার সামনে। আমি সোজা দৌড়ে গিয়ে পুকুরের ভেতর লাফিয়ে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আরাম অনুভব করি। ঠাণ্ডা পানি, আবার সারা গায়ে গরম কাপড়, অন্য ধরনের একটা আনন্দ।

আমার পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার খবরটা নিতুর কানে পৌঁছে যায় মুহূর্তেই। ও দৌড়ে এসে পুকুর পাড়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর ভয়াবহ উদ্বিগ্ন হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'এটা তুই কী করেছিস, ভাইয়া!'

পানির নিচে একবার করে মাথা ডুবাচ্ছি আবার একটু পর মাথাটা উপরে তুলছি আমি। নিতুর কথা শুনে মাথাটা উঁচু করে স্থির হয়ে বললাম, 'কেন, গোসল করছি।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে গোসল করছিস কেন ?'

'এখন তো ঠাণ্ডা লাগছে না, গরম লাগছে।'

'এতক্ষণ না বললি ঠাণ্ডা লাগছে। হঠাৎ করে গরম লাগল কেন তোর ?' নিতু পুকুরের দিকে আরো একটু নেমে আসে।

'তুই না বললি ঠাণ্ডা তেমন পড়ে নি। পুকুর পাড়ে এসে পুকুরের টলটলে পানি দেখে মনে হলো, তাই তো, ঠাণ্ডা তো তেমন পড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গে গরম লাগতে শুরু করে আমার, ঘামতে শুরু করি আমি। শেষে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

'তুই সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছিস ভাইয়া!'

'তাই ?' চিৎকার করে বলি আমি।

'পাগল না হলে কেউ সারা গায়ে মোটা মোটা শীতের কাপড় নিয়ে পুকুরের পানিতে গোসল করে!' নিতু বিরক্ত হয়ে বলে, 'পুকুর থেকে উঠে আয় তুই, এখনই উঠে আয়।'

'আমার গোসল করতে ইচ্ছে করছে যে।'

'ইচ্ছে করলে করুক, তোর আর এখন গোসল করতে হবে না, উঠে আয় তুই। মানুষজন জড়ো হওয়ার আগেই উঠে আয়।'

নিতু আশপাশে তাকাল। ওর দেখাদেখি আমিও তাকালাম। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন এসে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ আনন্দ নিয়ে তারা তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

পুকুর থেকে আস্তে আস্তে উঠে এলাম আমি। নিতু আমার দিকে হাত এগিয়ে দিল, আমি ওর হাত ধরলাম। হঠাৎ পাশ ফিরে দেখি, আমাদের পাশের বাসার শিহাব আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর চক্কর দিয়ে উঠল আমার। নিতুর হাত থেকে আমার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি দ্রুত শিহাবকে জাপটে ধরে আবার লাফ দিলাম পুকুরের ভেতর। তারপর ওর মাথা ধরে চুবাতে লাগলাম ইচ্ছে মতো। নিতু চিৎকার করে উঠল, 'ছোট ভাইয়া, কী করছিস, কী করছিস!' কে শোনে কার কথা, আমি ওকে চুবাতেই থাকি। অনেকক্ষণ পর ওর মাথাটা তুলে বলি, 'আর হাসবি ?'

মাথা এদিক ওদিক ঝাকায় শিহাব। ছেড়ে দেই আমি ওকে। তারপর তৃপ্তির একটা শ্বাস নেই। অনেকদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো আজ। ও প্রায়ই নিতুকে একা পেলে এটা-ওটা বাজে কথা বলে, নিতু আবার আমাকে এসে বলে। ঠিক পুরোপুরি খুলে বলে না, তবে যেটুকু বলে তাতেই আমি বুঝে যাই অসভ্যরকমের বাজে কথা বলে ও। বহু আগেই থেকেই ওকে তাই একটা প্যাদানি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সুযোগ হয়ে ওঠে নি, আজ হয়েছে এবং সুযোগটা কাজে লাগিয়েছি।

নিতু আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, 'তোর জন্য আর মান-সম্মান কিছু থাকবে না।'

মাঝে মাঝে আমার এমন হয় সারা রাত আমি জেগে থাকি। আমাদের বাড়ির মোটা নিম গাছটার গোড়ায় বসে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। নিম গাছের গোড়ায় বসে আকাশটা ঠিক দেখা যায় না, পাতার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে যা দেখা যায়, তাতেই আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। কোনো কোনো রাতে আকাশ থেকে এক একটা উল্কাপিণ্ড ছুটে আসে, কী যে তার রঙ, রঙিন করে ফেলে চারপাশ।

রাতে আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হই রাতজাগা পাখির গান শুনে। একা একা নিমগাছের পাকা নিম খায় সারা রাত, আর একটু পর পর গান গেয়ে ওঠে একা একাই। ওদের গানটা ঠিক গানের মতো শোনায় না, মনে হয় কাঁদছে, প্রিয় কাউকে হারানোর বেদনায় কাঁদছে।

ঘুম থেকে উঠে নিতু যত কাজই করুক না কেন একটা কাজ করতে ও কখনোই ভোলে না, বড় একটা কাঁসার প্লেটের ভেতর নাস্তা সাজিয়ে এনে সামনে বসবে আমার। তারপর যতক্ষণ না সবগুলো খাবার শেষ হবে ততক্ষণ বসে থাকবে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, ও আমার খাওয়ার মধ্যে কী মুগ্ধতা খুঁজে পায়।

সকালে আমাকে ভালো করে খাওয়ানোর অবশ্য একটা কারণ আছে। কারণ-অকারণেই মাঝে মাঝে আমি সকালবেলায় বাড়ি থেকে বের হয়ে যাই। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরে সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে ফিরে আসি। সারাদিন একটা কিছুও খাওয়া হয় না আমার। কেন যেন খেতে ইচ্ছে করে না।

কাঁসার প্লেটটা আমার সামনে দিয়ে এ মুহূর্তে নিতু আমার সামনে বসে আছে। আমি প্লেটের দিকে তাকালাম। বাবা বেঁচে থাকতে এ প্লেটে তিনি খেতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর মা চেয়েছিল এ প্লেটটাতে বড় ভাইয়া খাক, ভাইয়া খাওয়া শুরুও করেছিল, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন তা বন্ধ করে দেয়। কারণ আর কিছুই না, বড় ভাবির আপত্তি। আজকাল কাঁসার প্লেটে নাকি ব্যাকডেটেড মানুষরা খায়।

নিতু কাঁসার থালাটা আমার দিকে আরো একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'ওভাবে তাকিয়ে কী দেখছিস? রুটিগুলো ঠিকমতো গোল হয় নি, না?'

'আমি রুটি দেখছি না।'

'তাহলে?' নিতু থালার দিকে তাকিয়ে বলে, 'অ, বুঝতে পেরেছি, আজকের সবজিটা তোর পছন্দ হয় নি।'

'না, আমি সবজিও দেখছি না।'

'তাহলে?'

কিছু বলি না আমি, নিতুও জিজ্ঞেস করে না কিছু। আমি খেতে থাকি। একটু পর নিতু কিছুটা উসখুশ করে বলে, 'দুটো কথা বলব আজ তোকে।'

'বল।'

'ক'দিন ধরে একটা কাজের মেয়ে খুঁজছি, পাচ্ছি না। শুনেছি টিনশেডের বস্তিতে নাকি কাজের মেয়ে পাওয়া যায়, একটু খোঁজ নিবি তুই?'

নিতুর কথা শুনে আমি ওর চোখের দিকে তাকাই, ক্লান্ত চোখ। খুব ভোরে উঠে সবার জন্য নাস্তা বানাতে থাকে ও। সকাল আটটার মধ্যে মেজ ভাইয়া অফিসে যায়; বড় ভাবি নারীবিষয়ক কী একটা এনজিওতে জয়েন করেছে কয়েকদিন আগে, সকাল আটটার মধ্যে তিনিও বের হয়ে যান; ছোট ভাবি আজকাল একটা বুটিক শপ নিয়ে ব্যস্ত, তাছাড়া তাদের একমাত্র ছেলে নিলয়েরও খোঁজ নিতে হয় তাকে; বড় ভাইয়া ব্যবসা করে, অনেক রাতে বাসায় আসে, অনেক বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। মেজ দুলাভাই কাতার থাকেন, আর মেজ আপা তার শ্বশুরবাড়ি বাদ দিয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের এখানে থাকে, ওরও সময় হয় না সংসারের কোনো কিছু ছুঁয়ে দেখার। সারাক্ষণ টিভির সামনে বসে থাকে আর হিন্দি সিরিয়াল দেখে। সংসারটা যেন নিতুর, সংসারের সমস্ত কাজ করতে হয় ওকেই, সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। কেবল আমাকেই কিছু করতে হয় না। মাস্টার্সের একটা ভালো রেজাল্টের জন্য সবকিছু থেকে ছাড় পেয়ে যাই আমি। এমন কি আগে যে বাজার করতাম আমি, নিতু এখন সেটাও করতে দেয় না। বড় ভাইয়া আর ও পালাক্রমে কাজটা করে। মাঝে মাঝে এখনো যদি আমি করতে যাই, নিতু রেগে যায় ভীষণ। গলাটা ভারী করে বলে, 'এসব বাজার-টাজারের দিকে মনোযোগ দিস না তো ভাইয়া। মাস্টার্সের রেজাল্টটা তোর ভালো হওয়া দরকার, আর কারো জন্য না, তোর জন্যই দরকার।' আমি তখন বলি, 'তোর লেখাপড়া? তোরও তো অনার্সের রেজাল্টটা ভালো হওয়া দরকার।' ও তখন হেসে হেসে বলে, 'আমার আর লেখাপড়া করার দরকার কি! ক'দিন পরেই তো বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা হলে পড়াতে পারব, স্বামীর কাছে চিঠি লিখতে পারব, এই তো ব্যস।' নিতু হেসে হেসে কথাটা বলে বটে, কিন্তু ওর হাসির পেছনে লুকিয়ে থাকে অপ্রকাশিত অনেক দীর্ঘশ্বাস!

নিতুর দিকে আবার তাকাই আমি। ও কিছুটা সংকুচিত হয়ে মাথা নিচু করে বলে, 'এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন তুই! একটা কাজের মেয়ের খুব দরকার। আজই একটা কাজের মেয়ের খোঁজ নিস কিন্তু।'

'নেব।' রুটি খাচ্ছি আমি, নিতুর দিক থেকে থালার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলি, 'প্রথম কথাটা গেল, দ্বিতীয়টা বল।'

নিতু একটু থেমে থেকে বলে, 'বলতে লজ্জা লাগছে ভাইয়া।'

'লজ্জা লাগলে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু কথাটা তোকে বলা দরকার।'

'বলা দরকার?' নিতুর দিকে আবার তাকাই আমি, 'বলা দরকার হলে বলে ফেল।'

'মামা যেভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে, সম্ভবত এবার আমার বিয়েটা হয়েই যাবে।' মাথা নিচু করে ফেলে নিতু।

খাওয়া বন্ধ করে আমি বলি, 'তো?'

'কিন্তু আমার এখন বিয়ে করা ঠিক হবে না ভাইয়া।'

'কেন!'

'আমার অনার্স-মাস্টার্স করার কথা বাদই দিলাম, মার জন্য অন্তত আমার এ বাড়িতে আরো কিছু দিন থাকা দরকার।' নিতু অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'আমি না থাকলে মা বেশিদিন বাঁচবে না ভাইয়া।'

আমিও অস্পষ্ট স্বরে বলি, 'বাঁচবে।'

'কোথায় বাঁচবে!' নিতু হঠাৎ শব্দ করে বলে, 'মা আজ তিনদিন ধরে হাসপাতালে, এ বাড়ির কেউ দেখতে গিয়েছে তাকে। তিন বেলা তুই খাবার নিয়ে যাস, আর সন্ধ্যাবেলা তোর সঙ্গে আমি যাই। আর কারো মনেই হয় না এ বাড়ির কেউ একজন হাসপাতালে আছে।'

'মাকে তো প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাই হয়তো—।' মাথা নিচু করে খেতে থাকি আমি।

'দেখিস, মা এবার আর জান নিয়ে বাড়িতে ফিরবে না।'

'তুই তো প্রতিবারই এ কথা বলিস।'

'এবার সত্যি সত্যি বলছি।'

মার জন্য খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে নিতু। আমি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি। এমন সময় বড় ভাইয়া-বড় ভাবি, ছোট ভাইয়া-ছোট ভাবি, মেজ আপা একসঙ্গে এসে মার ঘরে ঢুকল। আমাকে আর নিতুকে দেখেই মেজ ভাইয়া বলল, 'তোরা আজ সন্ধ্যায় একটু বাসায় থাকিস। সবাইকে নিয়ে জরুরি একটা মিটিং করতে হবে আমাদের।'

কিছুটা চমকে উঠে আমি বললাম, 'কিসের মিটিং?'

'মাকে নিয়ে, না না—।' মেজ ভাইয়া তার কথার সংশোধনী এনে বলে, 'শুধু মাকে নিয়ে না, আরো অনেক কিছু নিয়ে আমাদের আজ মিটিং করতে হবে, বড় আপাকেও খবর দেওয়া হয়েছে, সন্ধ্যার আগেই এসে পড়বে।'

খুব ঠাণ্ডা গলায় নিতু বলে, 'হঠাৎ মাকে নিয়ে মিটিং!'

'হঠাৎ বলছিস কেন, মাকে নিয়ে আমাদের আরো আগেই মিটিং করা উচিত ছিল। মা কখন না কখন এক্সপায়ার করে, আমার তো মনে হয় এবারই করবে।' মেজ ভাইয়ার কথার মধ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

নিতু আর কিছু বলে না। একটু এগিয়ে এসে আমার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। আলতো করে একটা হাত রাখে আমার বাহুতে। একটু পর খেয়াল করি, ওর হাতের আঙুলগুলো বসে যাচ্ছে আমার বাহুতে। ওর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে দুঃখে।

সবাই এ ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর নিতু খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলে, 'ভাইয়া, তুই কি আমাকে একটু জড়িয়ে ধরবি! আমার প্রচণ্ড শীত করছে রে ভাইয়া, ভীষণ শীত করছে।' নিতু কাঁপছে, থরথর করে কাঁপছে ও।

মাথায় ক্যাপ আর গায়ে সাদা শার্ট-প্যান্ট পরা একটা লোক আমার সামনে এসে বলল, 'স্যার, আপনাকে ম্যাডাম ডাকে।'

আশপাশে তাকালাম আমি। কিন্তু আমার আশপাশে যারা আছে তাদের কেউই স্যার ডাক শোনার মতো না। লোকাল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে লোকাল বাসে ওঠে যারা, সাধারণত তারা কেউই স্যার ডাক শুনতে অভ্যস্ত না। শুনতে অভ্যস্ত না মানে কী, তারা জীবনে একবার হলেও স্যার ডাক শোনে নি, কেউ কখনো তাদের স্যার বলে সম্বোধন করে নি। বরং তারাই অন্যকে স্যার ডাকতে অভ্যস্ত।

আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভাব দেখে লোকটি বললেন, 'স্যার, আমি আপনাকে বলছি। ওই যে ম্যাডাম বসে আছেন গাড়িতে, উনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন।' হাত দিয়ে ইশারা করে রাস্তার ওপাশে লাল টকটকে ইয়া বড় কচ্ছপের মতো গাড়িটি দেখাল লোকটি।

গাড়িটির দিকে আরো একটু ভালো করে তাকালাম আমি। গাড়ির সবগুলো কাচ উঠানো। কালো কাচ, গাড়ির ভেতর কে বসে আছে তাও দেখা যাচ্ছে না। আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম আরো। লোকটি আমাকে একটু সাহস দেওয়ার মতো করে বলল, 'চলুন, কাছে গেলেই দেখতে পাবেন।'

লোকটাকে এবার ভালো করে দেখতে লাগলাম আমি। দেখা শেষ হলেই বললাম, 'আপনি কে?'

বেশ গর্বিত হওয়ার মতো করে লোকটি বলল, 'আমি ওই গাড়ির ড্রাইভার, নতুন জয়েন করেছি।'

'আপনার ম্যাডাম কি আমাকেই ডাকতে বলেছে, না অন্য কাউকে?'

'এসব ক্ষেত্রে সাধারণত ড্রাইভারদের ভুল হয় না স্যার। সঠিকভাবে গাড়ি চালানোর মতো তাদের জীবনটাও সঠিকভাবে চালাতে হয়। নইলেই সমস্যা। আসুন স্যার, আসুন।' ড্রাইভারটি এগুতে থাকে। একটু এগুনোর পর সে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনার হাতের খাবারের টিফিন ক্যারিয়ারটা আমাকে দিন, এটা এখন আমাকেই বহন করা উচিত। না হলে ম্যাডাম রাগ করবেন।'

ড্রাইভারে ভাষা শুনে আমি বললাম, 'আপনার জেলা কোথায় ?'

'কেন স্যার ?'

'বাংলা ভাষাতে আমরা অনেকেই কথা বলি, কিন্তু আপনার বাংলা বলাটা খুব সুন্দর।'

কান পর্যন্ত হেসে নিলেন ড্রাইভার, 'জি স্যার, কুষ্টিয়ার মানুষজন একটু সুন্দর করেই কথা বলে।'

'শুনুন ড্রাইভার সাহেব—।' আমি ড্রাইভারের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনি ভুল করছেন। যদিও আপনি বলেছেন, আপনাদের এসব ক্ষেত্রে ভুল হয় না। আপনি কি আপনার ম্যাডামের কাছে গিয়ে সিওর হয়ে নেবেন তিনি আমাকেই ডাকছেন ?'

'আমি সিওর স্যার।'

'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। প্লিজ, আপনি আরো একবার সিওর হয়ে নিন। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি এখানেই দাঁড়িয়েই থাকব।'

ড্রাইভার দু হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'স্যার, ম্যাডামকে আবার জিজ্ঞেস করতে গেলেই আমি ধমক খাব।'

'প্লিজ, আমার জন্য না হয় আপনি একবার ধমক খান।'

অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও ড্রাইভারটি রাস্তার ওপাশে চলে গেল। তারপর গাড়ির ওপাশে যাওয়ার একটু পরেই একটা কাচ নেমে এলো এপাশের। একটা মেয়ে অল্প একটু গলা বাড়িয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে ডাকছে আমাকে। চেনা চেনা লাগছে মেয়েটাকে, কিন্তু পুরোপুরি চিনতে পারছি না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা ভাবনা ভেবে ফেললাম। যেহেতু একটা মেয়ে ডেকেছে সুতরাং কোনো অসুবিধা থাকার কথা না। ঠিক সম্মোহিত নয়, কিছুটা ঔচিত্য নিয়েই এগিয়ে গেলাম মেয়েটির দিকে।

কাছে গিয়ে দেখি পুষি বসে আছে গাড়ির ভেতর। কিন্তু ওকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। মাথার চুলগুলো চিকন চিকন করে বেণি করেছে, প্রতিটা বেণির মাথায় আবার মাল্টিকালারের পুতি লাগানো।

আমি কিছুটা অবাক হয়ে বললাম, 'পুষি, তুই!'

'হ্যাঁ, তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'আমার কাছে!'

'বারে, এত অবাক হচ্ছো কেন ? তোমার কাছে বুঝি আমি এই প্রথম যাচ্ছি' পুষি একটু সরে বসে বলল, 'আসো, গাড়িতে উঠে আসো।'

'গাড়িতে উঠে কই যাব ?'

'তুমি তো মামির জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলে হাসপাতালে, তাই না ? খাবার নিতে হবে না।'

'কেন ?'

'আহ, এত প্রশ্ন করো না তো। গাড়িতে ওঠো আগে, তারপর বলছি।'

গাড়িতে উঠে বসি আমি। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে শুরু করে। পুষি আমার দিকে একটু ঘেঁসে বসে, 'মা একগাদা খাবার নিয়ে বসে আছে মামির সামনে। মা নিজেও নাস্তা করে নি। তারা দুজন এখন হাসপাতালে বসে নাস্তা করছে আর সারা রাজ্যের গল্প করছে। তোমার এখন সেখানে না গেলেও চলবে।' পুষি অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভালো কথা, তোমাকে না বলেছি তুমি আমাকে তুই তুই করবে না।'

পুষির মুখের দিকে তাকাই আমি। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে ও, এখনো বাচ্চাদের মতোই ছটফট করে। কোথাও এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সারাক্ষণ লাফালাফি, ছোটাছুটি আছেই। ছোটকালে ওকে নাকি বিড়ালের মতো দেখতে লাগত, সেই থেকে ওর নাম পুষি। ও অবশ্য নিজেই নিজের একটা নাম রেখেছে— ললিপপ। ওর কোনো এক বান্ধবীর নাম নাকি পপকর্ণ, সেটা শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের নাম রেখেছে ললিপপ।

'তোকে তুই তুই করব না তো কী করে বলব ?'

'তুমি তুমি বলবে।'

'তুই তুই আর তুমি তুমির মধ্যে পার্থক্য কি ?'

'আছে।'

'কী রকম ?'

'ও তুমি বুঝবে না।'

'আমি বুঝব না, কিন্তু তুই বুঝিস, না ?'

'বুঝিই তো।' পুষি মাথা চুলগুলো একটু ঝাঁকুনি দেয়। আশ্চর্য, চুলগুলো থেকে শব্দ হতে থাকে। আমি অবাক হয়ে বলি, 'কী রে, চুল থেকেও আজকাল শব্দ হয় নাকি ?'

'চুল থেকে না, চুলের মাথায় যে পুতিগুলো আছে, সেখানে থেকে হচ্ছে।' পুষি মাথাটা আবার ঝাঁকায়, আবার শব্দ হয়।

'আচ্ছা, এত সকালে তুই আমার কাছে যাচ্ছিলি কেন ?'

রাগী রাগী চোখে পুষি আমার দিকে তাকায়, 'তোমার কাছে মনে হয় এই প্রথম এত সকালে যাচ্ছি ? এর আগে যাই নি ?' পুষি গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকায়। রাগ করেছে ও।

পুষি এরকমই, অল্পতেই রেগে যায়। অবশ্য একটু পরেই আবার নিজে থেকেই হেসে ফেলবে। একটু পাগলামিও আছে ওর ভেতর। তবে আমার মতো না। মাঝে মাঝে খুব ভোরে ও চলে আসে আমাদের বাড়িতে। এসেই মাকে জড়িয়ে ধরে বলবে, মামি, আজ কিন্তু যাচ্ছি না, আজ সারাদিন এখানে থাকব। মা হাসতে হাসতে বলে, থাকবে। ও তারপর সোজা আমার ঘরে চলে আসবে। আমি হয়তো তখন ঘুমিয়ে আছি। ও আলতো করে আমার মাথায় হাত রেখে ডাকতে থাকবে আমাকে। আমি উঠতেই ও আমার পাশে বসবে। কিছুক্ষণ, তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, তুমি কী বলো তো অনি ভাইয়া! প্রায়ই তোমার ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যাই আমি, কিন্তু তুমি একদিনের মধ্যে তা এলোমেলো করে ফেল। এরপর থেকে আর গুছিয়ে দেব না কিন্তু। ও পুরোদমে ঘর গোছাতে থাকে, আর আমি ওর পাগলামি দেখি।

মাঝে মাঝে ভয়ের কিছু কাজও করে ফেলে ও। আমার ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় ও। তারপর আমাকে সামনে বসিয়ে বলে, 'একদম চুপ হয়ে বসে থাকবে তুমি। তোমাকে আজ অনেকক্ষণ দেখব আমি।'

'আমাকে দেখার কী আছে?'

'তোমাকে দেখার কী আছে, সেটা তুমি জানো না, আমি জানি।'

ও আমাকে স্থির করে বসিয়ে রেখে চেয়ে থাকে আমার দিকে। আর আমি ঘামতে থাকি অবিরত। একটা বড় হয়ে যাওয়া মেয়ে ঘর বন্ধ করে বসে আছে বড় হয়ে যাওয়া একটা ছেলের সঙ্গে! সকলে ভাববে কী? এ ভাবনাটা আমার মাঝে কাজ করে, কিন্তু আমাদের বাড়ির কারো মাঝেই সেটা কাজ করে না। সবাই পুষিকে ছোটখাটো পাগলই ভাবে, বড় লোকের আদুরে পাগল। নিতু হঠাৎ হঠাৎ দরজায় টোকা দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'ভাইয়া, তুমি ঠিক আছো তো, না ফায়ার সার্ভিস ডাকতে হবে?'

আমি জবাব দেওয়ার আগে পুষিই জবাব দেয়, 'নিতু আপু, তুমি ঠিক আছো তো?'

'কেন, আমার ঠিক না থাকার কোনো কারণ আছে?'

'আমার আছে?'

নিতু প্রসঙ্গটা অন্যদিকে নিয়ে যায় তখন, 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'হোক, আমরা খেতে বসার সময় আবার গরম করে দেবে। আপু শোনো।' পুষি বন্ধ দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'তুমি কিন্তু আমাদের সঙ্গে খাবে। আচ্ছা, তুমি আমার জন্য মোটা করে পরোটা বানিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।

'ঘি দিয়ে ভেজেছ?'

'হ্যাঁ, ঘি দিয়ে ভাজা হয়েছে। তোরা তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

আমাদের বাসায় সবসময় এক কৌটা ঘি থাকে। সেটা আর কারো জন্য না, পুষির জন্য। ও আমাদের বাসায় এলেই হয় ওকে ঘি দিয়ে পরোটা ভেজে দিতে হবে, না হয় ঘি আর চিনি দিয়ে মুড়ি মেখে দিতে হবে। ওর এই যন্ত্রণা আমাদের বাসার সবাই সহ্য করে। আমার দাম্ভিক বড় ভাবি, নিজের কাজে নিজে ব্যস্ত ছোট ভাবিও। কারণ আর কিছুই না, ওই যে বড়লোকের মেয়ে!

পুষি আমাকে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেয় যখন ও হুটহাট আমাদের বাসায় চলে এসে বলে, আজ আমার সঙ্গে সারাদিন বেড়াতে হবে তোমাকে। সেদিন আমার যত কাজই থাক, কোনো নিস্তার নেই। ওকে নিয়ে সারাদিন আমার ঘুরতে হয়। অবশ্য ঘুরতে আমার মোটেই খারাপ লাগে না। ওরকম দামি গাড়িতে ঘুরতে কার না ভালো লাগে।

রাগটা কমেছে পুষির। ও আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলে, 'আজ আমি অন্য একটা কারণে তোমার কাছে যাচ্ছিলাম।'

'কী কারণ?'

'একটা খবর জানাতে যাচ্ছিলাম।'

'কিসের খবর?'

'কাল থেকে আমি অনেক বড়লোক হয়ে গেছি। ব্যাংকে আমার নামে এখন অনেক টাকা।'

'কত টাকা?'

'সেটা বলতে পারব না, তবে অনেক টাকা।'

'এত টাকা তোকে কে দিল?'

পুষি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বাবা।'

'ফুপা!'

পুষি আরো একটু সরে বসল আমার দিকে। তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে তার মনোযোগ কোন দিকে তা বোঝার চেষ্টা করল। সম্ভবত তা বোঝা গেল না। কারণ ড্রাইভাররা চোখ সামনে রেখে গাড়ি চালায় বটে, কিন্তু তাদের কান থাকে পেছনে। পেছনের সিটে বসে কে কী কথা বলে, তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে ওরা। পুষি কিছুটা সতর্ক হয়ে বলল, 'কয়েকদিন ধরে দেখছ না অনেক ক্ষমতাবানের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ব্যাংকে অনেক টাকা পাওয়া যাচ্ছে, সেরকম আর কি। বাবা বোধহয় দুবুক থেকে চিঠি পাবে। বাবার অনেক কলিগ অলরেডি পেয়ে গেছে। বাবা তাই তড়িঘড়ি করে সবকিছু মার নামে, আমার নামে, ভাইয়ার নামে দিয়ে দিচ্ছে। এই যে এই গাড়িটাতে চড়ে আছো না, কাল থেকে

এ গাড়িটাও দেখতে পাবে না। বাবা এটা বিক্রি করে দিয়ে পুরাতন একটা গাড়ি কিনবে। সম্ভবত এ গাড়িটা বিক্রি করা হয়ে গেছে, কোনো একটা গ্যারেজ থেকে নাকি পুরাতন একটা গাড়িও কেনা হয়েছে।'

'তাই নাকি!'

'লেমন ভাইয়া ফোন করেছিল কাল, তোমার কথা জিজ্ঞেস করল।'

'ও কেমন আছে?'

'বলল তো ভালো আছে।'

'দেশের বাইরে গিয়ে কি কেউ ভালো থাকে। তাও অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা দেশে, যেখানে লোক সংখ্যা খুবই কম।'

'ও এখনো ফুপাজানের ওপর ক্ষেপে আছে, না?'

'অসম্ভব রকম ক্ষেপে আছে। ফোন করলে বাবার সঙ্গে ও তো কোনো কথাই বলে না। জানো তো, বাবার কাছ থেকে কোনো খরচও নেয় না ও। কী যেন একটা চাকরিতে জয়েন করেছে, তা দিয়ে লেখাপড়ার খরচ চালায়।'

'ভালো।'

'জানো, যে বাবা কোনোদিন নামাজের কথা মুখে নেয় নি সেই বাবা এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে মসজিদে গিয়ে। বাবা এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গ্রামে নাকি একটা বড়সড় মসজিদ বানিয়ে দেবে।'

'বলিস কী!'

'আরো একটা খবর আছে-আমরা সম্ভবত বাসাও চেঞ্জ করছি।'

'বাসা চেঞ্জ করে তোরা কোথায় যাবি?'

'ভাড়া বাসায় উঠব।'

'তোদের এত সুন্দর দামি বাসা ছেড়ে ভাড়া বাসায় উঠবি!'

'রাখো তোমার দামি বাসা। বাবার এখন জান বাঁচানো ফরজ। তুমি যদি দেখতে— মাঝে মাঝে বাবা বাসায় নামাজ পড়তে বসে যা হাউমাউ করে কাঁদে না।'

'ফুপু?'

'মা অবশ্য নামাজ টামাজের ধারে কাছে যায় নি এখনো, তবে ইদানীং দান-খয়রাত করছে প্রচুর। ভালো কথা—।' পুষি ফিসফিস করে কথা বলা বাদ দিয়ে একটু শব্দ করে বলে, 'মা, তোমাকে হারিকেন দিয়ে খুঁজছে।'

'কেন?'

'ভয়াবহ একটা কারণ আছে, কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি না।' পুষি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে, রহস্যময় হাসি।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে মা, পাশে ফুপু বসে আছেন। আমাকে দেখেই বেড থেকে নেমে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝে গেলাম ফুপুর আজ একটা ধান্দা আছে। কারণ সারা বছর ফুপুর সঙ্গে দেখা হলে তেমন করে কথাই বলেন না তিনি আমার সঙ্গে। কিন্তু প্রয়োজন পড়লেই জড়িয়ে ধরেন জান-প্রাণ দিয়ে।

ফুপু আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না বলার অবশ্য কারণ আছে। কারণটা পুষি। পুষি আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করুক এটা তিনি একদম চান না। ও একা একা আমাদের বাড়িতে আসুক, এটাও না। আগে অবশ্য আপত্তি করতেন না, শীতের দিনে হঠাৎ হঠাৎ আমার পাগলামির কথা জানার পর থেকেই যত আপত্তি।

মাস ছয়েক আগে পুষি আমাদের বাসায় এসে বলে, 'আজ আমি যা বলব তোমার তাই করতে হবে।'

তিনদিন পর আমার পরীক্ষা, পড়ছিলাম আমি। টেবিল থেকে মাথা ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, 'আমার পরীক্ষা পুষি।'

'পরীক্ষা তো তোমার সারাজীবনই থাকে। একদিন না পড়লে কিছু হয় না।' পুষি আমার হাত ধরে টানতে থাকে।

'তুই বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারছিস না পুষি।'

চোখ-কপাল কুঁচকিয়ে পুষি বলে, 'তুমি কি হিব্রু ভাষায় কথা বলছ যে তোমার কথা বুঝব না।' পুষি আমার হাত টেনে ধরে বলে, 'চলো না, প্লিজ। এটাই আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট, আর কখনো রিকোয়েস্ট করব না।'

মায়া হলো পুষির জন্য, এমনভাবে বলে না! বাসা থেকে বের হয়ে ও সোজা নিয়ে ঢুকল একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে। এক গাদা খাবার কিনে একটা লেকের ধারে বসল আমাকে নিয়ে। তারপর ওর মোবাইলটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ আমি যতক্ষণ না এখান থেকে যেতে চাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি

আমার পাশে বসে থাকবে। যদি এটা না করো, তাহলে লেকের পানিতে আমি কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ব। তুমি তো জানো আমি সাঁতার জানি না। আমি মারা গেলে বুঝবে জেলের ভাতের চাল কত মোটা।'

'আচ্ছা, তুই আজ গাড়ি নিয়ে আসলি না কেন?'

'আম্মুর সঙ্গে রাগ করে।'

সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে দেখি হুলস্থুল অবস্থা। ফুপু এসে সারা বাসা মাতিয়ে নিয়েছে— পুষি বাসায় নেই সেই সকাল থেকে, আমিও বাসায় নেই সকাল থেকে; আমরা এক সঙ্গে এ বাসা থেকে বের হয়েছি; সারা দিন কোনো খোঁজ নেই আমাদের; কোথায় গেছি কেউই জানে না; সবকিছু মিলিয়ে ফুপু চিৎকার করে বলছেন, আমি নাকি পুষিকে নিয়ে ভেগে গিয়ে বিয়ে করেছি। কথাটা শুনে মা থমকে বসে আছে, ভাবিরা আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে, ভাইয়ারা চিন্তাযুক্ত চেহারায় পায়চারি করছে। কেবল নিতুই স্বাভাবিক, ওর কোনো বিকার নেই, ও ওর মতো কাজ করে যাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে। ফুপু আমাকে দেখেই দৌড়ে এলেন, তারপর কোনো কথা না বলে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে, উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, ঠাস ঠাস করে আমার গালে থাপ্পড় মারলেন কয়েকটা। আমি তো হতবাক, হতবাকে আমার চোখ বেরিয়ে আসার যোগাড়। ফুপু চিৎকার করে বললেন, 'পুষি কোথায়, হারামজাদা?'

'কেন, আপনাদের বাসায়।'

'কোথায় ছিলি তোরা এতক্ষণ?'

'সেটা আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন।'

'তুইও তো সঙ্গে ছিলি, তুই বল।' ফুপু আমাকে আবার মারতে আসেন, তার আগেই নিতু এসে ফুপুর একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'ব্যস, অনেক হয়েছে ফুপু। আপনি অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আগে নিজের মেয়েকে সামলান, নিজের মেয়েকে শাসন করুন, তারপর অন্যের ছেলেকে মারুন।'

মা এসে নিতুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চায়, নিতু ঝটকা দিয়ে মার হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে ফুপুর একেবার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি আপনাকে একটা কথা বলছি, পুষি যেন আর কোনো দিন আমাদের এখানে না আসে। আসলে থাপরিয়ে ওর সবগুলো দাঁত ফেলে দিব। তখন দাঁত পড়া মেয়েকে বিয়ে দিতে আপনার কিন্তু সমস্যা হবে।'

আবার এসে মা নিতুর একটা হাত ধরে, নিতু আবার ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'আমরা মানুষ না মা, কেউ আমাদের মানুষ মনে করে

না। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমাদের সবাই পশু ভাবতে শুরু করেছে।' নিতু শব্দ করে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, 'ভাইয়া, আল্লার কছম, পুষির সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, তুই যদি ওর সঙ্গে কথা বলিস, তাহলে আমি বিষ খাব। অপমান হওয়ার চেয়ে বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভালো।'

গজগজ করতে ফুপু চলে যান। কিন্তু তিনদিন পর তিনি আবার আমাদের বাড়িতে আসেন, সঙ্গে পুষি। আমাকে, নিতুকে জড়িয়ে ধরে একাকার অবস্থা, এক ফোঁটা দুই ফোঁটা কাঁদলেনও বোধহয়। আমি তখনও বুঝতে পারি নি ফুপুর এবারের ধান্দাটা কী ? ফুপু সাধারণত আমাদের বাসায় খান না, সেদিন খেলেন। খেতে খেতে তিনি খুব নরম স্বরে বললেন, 'অনি, তুই কি আমার একটা উপকার করে দিতে পারবি ?'

ফুপুর ধান্দা আমি বুঝতে পারলাম। ফুপুর আথ্রাইটিস আছে, অনেক ওষুধ খেয়েছেন, ঠিক হয় না। সম্প্রতি একটা কবিরাজের সন্ধান পেয়েছেন তিনি, পঞ্চগড়ে থাকে সেই কবিরাজটা, তার ওখান থেকে ওষুধ এনে দিতে হবে।

কিন্তু আজকে ফুপুর ধান্দাটা কি ? ধান্দাটা নিশ্চয় বড়সড় হবে, না হলে মাকে দেখতে ফুপু আসেন হাসপাতালে, তাও খালি হাতে না, একগাদা খাবার নিয়ে। হোটেলের খাবার না, ফাস্ট ফুডের দোকানের খাবার না, নিজ হাতে রান্না করা খাবার!

পুষি হাসতে হাসতে ফুপুকে বলল, 'তোমার নাকি কোনো কাজ করি না আমি। অনি ভাইয়াকে দরকার তোমার, এই যে তাকে এনে দিলাম।'

ব্যাগ থেকে একটা মোবাইল বের করতে করতে ফুপু বলেন, 'এত দাম দিয়ে মোবাইলটা কিনলাম, কী যে হয়েছে এটার, কলই করতে পারি না আমি।'

পুষি একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'দেখি।' ফুপুর হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে পুষি দেখে বলে, 'তোমার ফোন তো লক করা!'

'লক করল কে ?'

'আমিই তো করে দিলাম। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! চাপ পড়ে পড়ে কার কার কাছে কল চলে যাচ্ছিল না তোমার।'

'লকটা খুলে দে।'

'আমি খুলে দেব কী, তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। লক খুলতে আর লক করতে কিন্তু একই কাজ করতে হয়।'

পুষি ফুপুকে লক-বিষয়ক সব শিখিয়ে দিল। ফুপু আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আচ্ছা, তোর কোনো মোবাইল নেই ?'

'মোবাইল দিয়ে কী করব আমি ?'

'অনেক সময় দরকার পড়ে না ?'

'আমার পড়ে না। যদি আমাকে কারো দরকার পড়বে সে আমাকে খুঁজে নেবে। মোবাইল মানেই হচ্ছে সেধে সেধে যন্ত্রণা কিনে আনা। রাত নাই, দিন নাই সব সময় বেজে ওঠা, মানুষের প্রাইভেসি নষ্ট করে দেয় একদম।'

'অত কথা বলতে হবে না তোকে। আমি পুষির কাছে একটা মোবাইল কিনে দেব, তুই সেটা ব্যবহার করবি। মাসে মাসে তোকে একটা তিনশ টাকার কার্ডও কিনে দেব আমি।' ফুপু বেশ গম্ভীর হয়ে বলেন।

বুকের ভেতর এবার সত্যি সত্যি মোচড় দিয়ে ওঠে আমার। এবার নিশ্চয় অনেক বড় ধান্দা ফুপুর। কিন্তু ধান্দাটা কিসের বুঝতে পারছি না, আবার জিজ্ঞেসও করতে পারছি না ফুপুকে।

মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা শেষ করে ফুপু বললেন, 'ভাবি তো ঘুমাচ্ছে, আমি এখন যাই। তোকে আজকেই একটু বাসায় আসতে হবে যে।'

'কেন ?'

'জরুরি কিছু কথাও আছে, দরকারও আছে।' ফুপু একটু থেমে বলেন, 'তা কখন আসছিস তুই ?'

'সময় পেলেই চলে আসব।'

'সময় পেলে না, দুপুরে তুই আজ আমার সঙ্গে খাবি।'

বুকের ভেতর এতক্ষণ যে মোচড় ছিল এখন পেটের ভেতরও শুরু হলো এটা। মহা মুশকিল, সারা শরীর মোচড়াতে থাকে আমার। একটু পর খেয়াল করি আমার চোখগুলোও মোচড়াচ্ছে। সেই মোচড়ানো চোখ দিয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়ানো ফুপুও মুচড়ে মুচড়ে উঠছেন। মোচড়াতে মোচড়াতে চরকির মতো তিনি ঘুরছেন আমার সামনে।

ফুপু চলে যাওয়ার একটু পরেই মা জেগে ওঠে। আমাকে দেখেই মা তার হাতটা এগিয়ে দেয়। আমি মার পাশে বসে তার ক্ষিণ হাতটা জড়িয়ে ধরি। কেমন যেন কেঁপে ওঠে মা। মার ফর্সা হাতের ওপর সবুজ রঙের রক্তনালিগুলো ফুটে আছে। সবুজ আর নীলচে রঙে ভরে গেছে তার সারা হাত।

মা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'কখন এসেছিস বাবা ?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

'তোর ফুপু চলে গেছেন ?'

'হ্যাঁ।

'তোর ফুপু তোকে জানি কী বলবে, বলেছে সেটা ?'

'এখনো বলে নি, বাসায় যেতে বলেছে।'

'যাই বলুক, ভালো করে শুনিস বাবা, মুরব্বি মানুষ।' মা আমার হাতটা তার গালের নিচে দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ দুটো বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে আবার। অথচ এ কাজটা করতাম আমরা— আমি আর নিতু।

রাত হলেই আমরা ভূতের ভয় পেতাম। কিছুতেই ঘুম আসত না আমাদের। সারাক্ষণ মনে হতো ঘরের ভেতর কে যেন আছে, সে আমাদের চুপি চুপি দেখছে, সুযোগ পেলেই গলা চেপে ধরবে কিংবা কামড়ে ধরবে বড় বড় দাঁত দিয়ে। আতঙ্কে থাকতাম আমরা সর্বক্ষণ।

মা তখন এসে আমাদের গল্প শোনাত— রাক্ষস মারার গল্প, ভূতকে বোতলে ভরার গল্প, দৈত্যর মাথা কেটে ফেলার গল্প। গল্প গল্প শুনতে ভয় কেটে যেত আমাদের। আমরা তবুও মার একটা হাত নিয়ে গালের নিচে দিতাম, ঘুমিয়ে পড়তাম নিশ্চিন্তে।

বাবা অসম্ভব রাগী মানুষ ছিলেন, একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। ঠিক সাড়ে আটটার সময় বাবা অফিসের উদ্দেশে বাসা থেকে বের হতেন, বাসায় ফিরতেন ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। বিকেল এই সাড়ে পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে আটটা— এই সময়টুকু বাবা একদম নড়তে পারতেন না মাকে ছাড়া। বাবা গোসল করতেন, মা লুঙ্গি-গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বাথরুমের সামনে; বাবা খেতে বসতেন, মা সামনে বসে থাকত মূর্তির মতো; বাবা অফিসের কাপড়-চোপড় পড়তেন, মা সবগুলো কাপড় হাতে নিয়ে একটা একটা করে এগিয়ে দিত বাবার দিকে। অফিসে যাওয়ার আগ মুহূর্তে বাবা একটা পান খেতেন, মা সেই পান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত নিচ্ছিদ্র প্রহরীর মতো, যেন চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা সেই পানটা পান মুহূর্তেই।

ছুটিরগুলোতে আমাদের সময়টা কাটত সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে। বাবা বাজার করতেন, মার সঙ্গে বসে সেগুলো কাটতেন, ধুতেন, রান্না করতেন। তারপর গোসল করে বাবা নামাজটা পড়েই খেতে বসতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা সবাই গোল হয়ে খেতে বসতাম। পরিবারের কেউই বাদ যেত না সেদিন, এমন কি আমাদের কাজের মেয়েটাও। সপ্তাহের ছয়দিন মা আমাদের বেড়ে দিত, ছুটির দিনে বেড়ে দিতেন বাবা। সবার পাতে পরিমাণ মতো খাবার দিয়ে শেষে নিজের প্লেটে নিতেন বাবা। সবচেয়ে মজা হতো বাবা যখন মার পাতে খাবার বেড়ে

দিতেন। মা লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে যেত, তাই দেখে মৃদু ধমক দিতেন বাবা। বাবার সঙ্গে সবাই কথা বলতাম খুব মেপে মেপে, পারত পক্ষে আমরা বলতামই না। কিন্তু নিতু বলত চট চট করে। নিতু ছোট বলেই হয়তো একটু বেশি ভালোবাসত বাবা ওকে। মার লজ্জা পাওয়ার সময় নিতু তাই প্রায়ই বলত, 'বাবা, একটা মানুষ কখন আরেকটা মানুষের সামনে কুঁকড়ে যায় জানেন ?'

বাবা শান্ত চোখে নিতুর দিকে তাকাতেন, কিছু বলতেন না।

'যখন সে অস্তিত্বের সংকোটে ভোগে। বাবা—।' নিতু বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এতগুলো বছর সংসার হলো আপনাদের, মার তবু ভয় গেল না। খুব খারাপ লাগে বাবা।'

কেমন যেন লজ্জা পান বাবা, ম্লান হেসে নিতুর মাথায় একটা হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন, 'এটা আমার অক্ষমতা রে মা, আমাকে ক্ষমা করে দিস।' বাবার এই একটি কথাতেই আমরা অসম্ভব শান্ত হয়ে যেতাম, সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যেত আমাদের নিমেষেই।

কোনো কোনো দিন সারা দিন কাজ করার পর মা বিকেলে খেতে বসত। আমরা অনেকেই তখন ঘিরে বসতাম মাকে। মা আর তখন কতটুকু খেত, মার মাখানো খাবারগুলোর অধিকাংশটুকুই আমাদের পেটে যেত। খাবার যেত আমাদের পেটে আর তৃপ্তি পেত মা।

জীবনের দায়, দেনা শোধ করতে করতে মা আর আগের মা নেই। রোগাক্রান্ত জীবন যাপনে মা এখন ছোট হয়ে গেছে, আমাদের ছোটকালের চেয়ে ছোট; মা আর এখন আমাদের মুখে খাবার তুলে দিতে পারে না, আমরা তাকে দেই; মা আর আমাদের শাসন করে না, আমরা বরং করি। কিন্তু আমাদের মার সেই হাতটাই রয়ে গেছে— মমতা জড়ানো, শান্তি মাখানো, নিঃস্বার্থ।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেল— আমি সালাম দেব কী, উল্টো ফুপাজানই সালাম দিলেন আমাকে। অথচ ফুপাজানের বাসায় কখনো এলে আমাকে সালাম দেওয়া তো দূরের কথা, ভালো করে কথাই বলতেন না আমার সঙ্গে। একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা দেখাতেন, অবহেলাও— যা ছিল অপমানকর, বিরক্তিকর।

ভালো করে তাকালাম ফুপাজানের দিকে। মাত্র কয়েকদিনের নামাজে মস্ত বড় একটা দাগ সৃষ্টি হয়েছে কপালে। মাথায় টুপি পরেছেন তিনি, মুখে উদীয়মান দাড়ি, পরকাল কিংবা অন্য কোনো কারণে ভীতসন্ত্রস্ত- চেহারা, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরনে, হাতে একটা লম্বা সৌন্দর্যমণ্ডিত তসবিহ। গা দিয়ে ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বের হচ্ছে তার, অবিকল জর্দার গন্ধের মতো।

ফুপাজান আমাকে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে প্রায় চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'আল্লাপাক তোমাকে কেমন রেখেছে, বাবা?'

ফুপাজানের দু হাতের মাঝ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছি আমি, কিন্তু পারছি না। তিনি আমাকে ধরেই আছেন, চাপতে চাপতে প্রায় বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। কোনো রকমে তার সেই হাতের গ্রাস থেকে বের হয়ে বললাম, 'জি, আমি ভালো আছি ফুপাজান।'

'না, এভাবে তো বলা ঠিক হলো না বাবা। তোমাকে ভালো রেখেছেন আল্লাপাক।' ফুপাজান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী, ঠিক বলেছি না? সুতরাং তুমি ভালো আছো এটা বলার আগে তোমাকে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাপাক আমাকে ভালো রেখেছেন। বাবারে, আল্লাপাকের শুকরিয়া আদায় করে না চললে জীবনটা বৃথা বাবা।' ফুপাজান আমার একটা হাতে ধরে তার ঘরে নিয়ে যেতে বললেন, 'আসো, তোমাকে আজ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখাই।'

ফুপাজানের ঘরে ঢুকেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ যতটা না অবাক হয়েছি, তার চেয়ে কয়েশ গুণ অবাক হলাম এখন। ঘরের সবগুলো দেয়াল কাবা শরীফের বিভিন্ন পোস্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া; বিছানার চাদরটা মাজারের লাল

গালিচার মতো বিছানো; কাচ দিয়ে বাঁধানো কী একটা মাজারের ছবি পশ্চিম পাশের দেয়ালে ঝুলানো, ছবিটা আবার সদ্য তাজা তাজা লাল গোলাপের মালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ঘরের এক কোনায় একটা টুলের ওপর মোটা মারফতি ধরনের একটা বই রাখা, তার সামনে অনেকগুলো আগরবাতি জ্বলছে। আগরবাতির ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা।

বিছানায় বসতে বসতে খালুজান বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে বসো বাবা, আমার পাশে বসো।'

ঘোর লাগা চোখে আমি ফুপাজানের দিকে তাকাই। চোখে সুরমাও লাগিয়েছেন তিনি। আমি বিছানায় বসতেই ফুপাজান পা তুলে বসলেন। আমার দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললেন, 'তুমি ভালো আছো তো বাবা?'

'জি, ভালো আছি।'

'আলহামদুলিল্লাহ। তোমার মায়ের খবরটা শুনেছি, দেখতে যাব বলে মন স্থির করেছি, কিন্তু সময় করতে পারছি না। তা ছাড়া একটানা সাতদিন নফল রোজা করব বলে নিয়ত করেছি, আজ তার চারদিন চলছে। রোজা রেখে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।' ফুপাজান কিছুটা ফিসফিস করে বলেন, 'কেন যেতে ইচ্ছে করে না জানো?'

'কেন ফুপাজান?'

'রাস্তাঘাটে এখন বেপর্দা মেয়েলোকে সয়লাব। ওদের দিকে তাকালেই ঈমান-আমান সব নষ্ট হয়ে যায়।' ফুপাজান বেশ উদাস গলায় বলেন, 'বাবারে, কেয়ামত আসতে আর দেরী নেই, মেয়েরা এখন রাস্তাঘাটে ন্যাংটা হয়ে চলে, পুরুষের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নাউজুবিল্লাহ।'

মাথা নিচু করে ফুপাজান 'তওবা তওবা' করতে থাকেন। আমি তার দিকে রহস্যভরা চোখে তাকাই। মেয়েদের নিয়ে ফুপাজান এত আপত্তিজনক কথা বলছেন, অথচ এই কয়েক বছর আগেও তার যন্ত্রণায় ফুপু কোনো কাজের মেয়ে রাখতে পারতেন না বাসায়।

ফুপার হঠাৎ এই পরিবর্তনের আসল কারণটা আমি ভেবে বের করার চেষ্টা করছি। সড়ক ও জনপথ বিভাগে যে কয়জন অতিরিক্ত প্রকৌশলী আছেন তিনি হচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন। কয়েকদিন আগে হুমকি দিয়ে ঘুষ আদায়ের অভিযোগে সড়ক ও জনপথ বিভাগের সাত প্রকৌশলীসহ আটজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সম্ভবত এদের সঙ্গে গোপনে গোপনে ফুপাজানও জড়িত। দুদক টের পেয়েছে সেটা এবং ফুপাও জেনে গেছেন ব্যাপারটা। আর দুদক যদি সত্যি সত্যি ইনভেস্টিগেশনে আসে, তাহলে ফুপারও কারাগারে যাওয়া নিশ্চিত। তিনি

যে কয় বছর ধরে চাকরি করেন, তার যদি একটা টাকাও খরচ না করে জমান তিনি, তাতে যে টাকা জমবে, তা দিয়ে বেশির পক্ষে তিনতলা একটা বিল্ডিং হতে পারে। অথচ ফুপাজানের ছয়তলা বিল্ডিং, তাও একটা না, দুইটা না, তিনটা। আর তিনি যে গাড়ি ব্যবহার করেন তার দাম কয়েক লক্ষ টাকা। ব্যাংকে যে কত আছে তা আল্লাই জানে।

খুব মনোযোগ দিয়ে তসবীহ জপছেন ফুপাজান। মৃদু স্বরে তিনি আল্লা আল্লা করছেন। আমার প্রচণ্ড হাসি পায় ব্যাপারটা দেখে। ফুপাজানের তসবীহ টেপা কেন, তিনি যদি প্রতি বছর হজ করেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, তার সব ধন-সম্পদ বিলিয়ে দেন, তবু তার পাপ মোচন হবে না। ফুপাজানের পাপ মোচন হওয়ার একটাই উপায় আছে, তা হলো-তার শরীর থেকে সব রক্ত বের করে সেখানে নতুন রক্ত ভরা, গায়ের চামড়া তুলে কোনো নতুন চামড়া লাগানো আর গরুর খাঁটি দুধ দিয়ে একনাগাড়ে সাতদিন গোসল করাতে হবে তাকে। তাতে যদি কিছু একটা হয়!

তসবীহ টেপা থামিয়ে ফুপাজান নিজের বুকে একবার ফুঁ দেন, আরেকবার আমার দিকে দেন। তারপর গলাটা নিচু করে বলেন, 'তুমি কি আমার এ পরিবর্তন দেখে অবাক হচ্ছো ? অবাক হয়ো না বাবা, আল্লাহ কখন যে কাকে হেদায়েত করেন বলা মুশকিল। শোনো, তোমাকে একটা গোপন কথা বলি, কথাটা তোমার ফুপুকেও বলি নি। কথাটা হলো— সাতদিন ধরে স্বপ্নে দেখি কে যেন আমার ঘরে এসে বলে, ওরে শরীফুজ্জামান, এখনো সময় আছে, আল্লার পথে আয়। প্রথমে আমি তেমন বুঝতে পারি নি, ভেবেছি স্বপ্ন তো স্বপ্নই। পরশু দিন হঠাৎ মনে হলো— আরে, আমি এটা কী করছি! স্বয়ং আল্লাপাক তো কাউকে পাঠিয়ে আমাকে তার পথে আসার জন্য হুকুম করছেন, আর আমি কিনা তা না মেনে হেসে-খেলে বেড়াচ্ছি। তারপর থেকেই আমার এ পরিবর্তন। সোবাহানাল্লাহ!'

'ফুপাজান, ফুপু কোথায় ?'

'তিনি তো তোমাকে মাকে দেখতে গেছেন।'

'না, হাসপাতালে ফুপুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চলে আসার সময় ফুপু বললেন, বাসায় আসতে। তাই চলে এলাম। সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা। পুষিও ছিল সঙ্গে।'

'তাহলে বোধহয় কোনো কাজে আটকে গেছে। তুমি কি কিছু খাবে ? ফ্রিজে অনেক খাবার আছে, তোমার ক্ষুধা লাগলে সেখান থেকে ইচ্ছে মতো খেও। লজ্জা পেও না, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে লজ্জা করতে নেই।' ফুপাজান একটু সোজা হয়ে বসে বলেন, 'তোমাকে তো একটা সুখবর বলা হয় নি। আমরা নিয়ত করেছি— আগামী বছর আমি আর তোমার ফুপু একসঙ্গে হজে যাব।'

'খুবই ভালো কথা।'

'আল্লাপাকের হুকুম, মানতেই হবে আমাদের।'

'ফুপু কি রাজি হয়েছেন?'

'তার তো রাজি না হওয়ার কিছু নেই। তার ওপরও আল্লার হুকুম হয়েছে, তাকেও হজে যেতে হবে।'

বাইরে গাড়ির শব্দ হয়। ফুপাজান আবার তসবীহ জপার প্রস্তুতি নিতে নিতে বলেন, 'তোমার ফুপু বোধহয় এলেন।'

বলতে বলতে ফুপু এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই আবার জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আরে, তুই কখন এলি?'

'এই তো একটু আগে।'

'ভালো করেছিস। সকালে রান্না করে গিয়েছি, গরম করেই টেবিলে দিচ্ছি। তারপর তোর সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার।' ফুপু চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'রূপচাঁদা মাছ, চিংড়ি মাছ, খাসির মাংস, সবজি, ডাল, তিন রকমের তিনটি ভর্তা আছে, এবার বল তোর অন্য আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে কি না?'

'না।'

'আরে বল না, এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন তুই! ফুপুর কাছেই তো বলবি, আর কারো কাছে বলবি নাকি!'

'না, যা আছে তাতেই চলবে।'

'বাইরে থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়েছিস?'

'না।'

'হাতমুখ ধুয়ে নে। তুই যেন আবার গেস্টদের বাথরুমে যাসনে, লেমনের বাথরুমে নতুন সাবান, তোয়ালে আছে, সেখাসে যাস। আমি কিচেনে যাচ্ছি, কিছু লাগলে পুষিকে বলিস, পুষি ওর ঘরেই আছে।'

'আপনি কিচেনে যাবেন কেন, কোনো কাজের মেয়ে নেই?'

'আমার কপালে কোনো কাজের মেয়ে নেই। আগে ছিল এক রকম সমস্যা, এখন আরেক রকম।'

ফুপু কিচেনে ঢোকেন, ফুপাজান বিছানায় বসে তসবীহ জপতে থাকেন, আর আমি চলে আসি পুষির রুমে। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে পুষি বলে, 'সবকিছু কেমন পাল্টে গেছে, না?'

'হ্যাঁ, সবকিছু অন্যরকম।'

খেতে বসেই ফুপাজান সবার উদ্দেশে বললেন, 'খাওয়ার আগে সবাই ভালো করে হাত ধুয়ে নেবে।'

পুষি একটু রেগে গিয়ে বলল, 'খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধোয় না কারা, সবাই ধোয়।'

'আর সবাই বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে।'

'আর কারো শুরু করতে হবে না তুমি শুরু করলেই হবে, বাবা।'

'এটা কী ধরনের কথা হলো! সবাই কি একজনের মুখ দিয়ে খায়, যার যার মুখ দিয়ে সে সে খায়। সুতরাং খাওয়ার সময় সবাইকে বিসমিল্লাহ বলতে হবে, খাওয়ার পরে আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লার হুকুম।'

পুষি মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলে, 'বাবা, তুমি হঠাৎ করে আল্লার হুকুম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে যে?'

'এসব ব্যাপার হঠাৎ করেই আসে। তুই ওসব বুঝবি না।' ফুপাজান আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'খাবার হচ্ছে আল্লার নিয়ামত। প্রতিটা খাবারের কণা ভালো করে চাবিয়ে খেতে হয়। একটা দানা মাটিতে পড়ে গেলে তা তুলে ধুয়ে খেতে হয়। এ নিয়ে একটা হাদীস বলি তোকে—।'

'চুপ করো তো। তুমি ইদানীং খুব বেশি কথা বলছ। নাও, সবকিছু তোমার পছন্দ মতো রান্না করা হয়েছে, মনোযোগ দিয়ে খাও।' ফুপু বলেন।

'আমার আর এখন তেমন কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। বয়স হয়েছে না, আর কত।' ফুপাজান আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখন তো অনিদের খাওয়ার সময়। দাও দাও, ওর পাতে বড় একটা রূপচাঁদা মাছ তুলে দাও।'

ফুপাজান খাচ্ছেন না, থালার ভেতর ভাত নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করছেন। তাই দেখে ফুপু বললেন, 'তুমি খাচ্ছো না কেন?'

'এই তো খাচ্ছি।' বলেই ফুপাজান এক লোকমা ভাত মুখে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বমি করে ফেললেন হড়হড় করে। সরে যাওয়ার সময় পেলেন না, ডাইনিং টেবিলের ওপরের সবকিছু নষ্ট করে ফেললেন। ফুপু ফুপাজানকে ধরা বাদ দিয়ে খাবার নষ্ট করার জন্য অস্থির হয়ে গেলেন রেগে মেগে। পুষিকে বললেন, 'তোর বাবার আক্কেল দেখলি! বমি করছে করুক, বাথরুমে গিয়ে করবে না। এতগুলো খাবার নষ্ট হলো!'

বমি করতে করতে ফুপাজান মেঝেতে শুয়ে পড়েছেন। অবস্থা বেগতিক। দ্রুত আমি ফুপাজানকে জড়িয়ে ধরে ফুপুকে বললাম, 'ফ্যানটা একটু জোরে চালিয়ে দিন না ফুপু। ফুপাজান তো ঘেমে একেবারে ভিজে গেছে।'

'ভিজে গেছে ভিজুক। কয়দিন ধরে এক সং শুরু করেছে। দুদক না মুদুক, তার ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ঠিক মতো খায় না, ঘুমায় না, সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে। আমাকেও যদি একটু খেতে দিত, ঘুমাতে দিত!'

পুষি চিৎকার করে বলে, 'মা, তুমি চুপ করো তো। এখন এসব বলার সময় হলো। তুমি না—।' পুষি আমাকে বলে, 'অনি ভাইয়া, বাবাকে একটু উঁচু করে ধরো তো, বিছানায় নিয়ে যাই বাবাকে।'

ফুপাজান গোঙাতে থাকেন, সারা গা ভিজে গেছে তার। ফুপু বাথরুম থেকে একবালতি পানি এনে মুখ ধুয়ে দিতে থাকেন ফুপাজানের আর চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন।

পুষি আবার চিৎকার করে বলে, 'মহা মুশকিল, তুমি আবার কাঁদতে শুরু করলে কেন?'

'দেখছিস না তোর বাবা কেমন করছে।'

'বাবা তেমন কিছুই করছে না। বমি করার সময় মানুষ এমনই করে। বাবার গায়ের পাঞ্জাবিটা খুলে দাও, তারপর ভালো করে গা-হাত-পা-মুখ ধুতে হবে।' পুষি খালুজানের পিঠের নিচে হাত ঢুকিয়ে তাকে তোলার চেষ্টা করে। তার আগেই আমি বলি, 'তুই সর, পারবি না তুই। ফুপাজানকে কোথায় নেব বল?'

'এখন তো মনে হচ্ছে বাথরুমে নিতে হবে। সারা গা ভিজে গেছে, গোসল করাতে হবে বাবাকে।'

পাঁজাকোলে করে ফুপাজানকে বাথরুমে নিয়ে যাই আমি। মাশাল্লাহ ফুপাজানের শরীরের ওজনও, ভুঁড়িটার ওজনই কমপেক্ষে দেড় মণ হবে। আর একটু হলে আমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

ফুপু বাথরুম বন্ধ করে ফুপাজানকে পরিষ্কার করতে থাকেন। না, আজ আর ফুপুর জরুরি কথাগুলো শোনা হবে না আমার, ফুপু আজ সে কথাগুলো বলতেও পারবেন না আমাকে। জরুরি কথা না শুনেই আমি ফুপুর বাসা থেকে বের হয়ে আসি।

মা ঘুমিয়ে আছে এখনো, পাশে নিতু বসে আছে। মার কপালে হাত বুলাচ্ছে ও। আমাকে দেখে মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'ভাইয়া, এসেছিস! এতক্ষণ একা একা থাকতে থাকতে ভীষণ ভয় লাগছিল রে।'

নিতুর পাশে একটা চেয়ার টেনে এনে বসি আমি। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, 'কখন এসেছিস তুই?'

'দুপুরের খাবার নিয়ে আসলাম।'

'মা তো এখনো ঘুমিয়ে আছে।'

'দুপুরে একবার ভেঙেছিল, অল্পক্ষণ। একটু পর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।' নিতু আমার দিকে ঘুরে বসে।

'খেয়েছে মা?'

'তেমন কিছু খায় নি।'

'ডাক্তার এসেছিলেন?'

'সকালে একবার দেখে গেছেন। আবার কখন যে আসে।' নিতু আমার দিকে কাতর চোখে তাকায়। আমি ওর একটা হাত ধরি। কেমন যেন কাঁপছে। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না ও।

'এই, তুই এমন করছিস কেন নিতু!'

মাথা চেপে ধরে নিতু একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'না, ঠিক আছে।' নিতু আরো একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'রাতে মা একা থাকে। কেউ একজন থাকা দরকার এখানে।'

'আমরা একটা বুয়া ঠিক করে দিয়েছি না? একটা নার্সকেও তো বলা হয়েছে স্পেশালভাবে। এর জন্য ওদের আমরা আলাদা করে পে করছি না!'

'যতই ওদের পে করি ওরা কি আপনজনের মতো দেখবে?'

নিতুর দিকে ভালো করে তাকাই আমি। ওর চোখের নিচটা কালো হয়ে গেছে। সম্ভবত রাতে ও ঘুমায় না। আমি ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলি, 'রাতে তুই ঘুমাস না, না?'

'ঘুম আসে না ভাইয়া। রাতে মা একা একা এখানে থাকে, কেমন থাকে, কোনো অসুবিধা হয় কি-না, কিছুই তো বুঝতে পারি না। মাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে মা-ও কিছু বলে না।' মাথা নিচু করে ফেলে নিতু।

'এখানে থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'কোথায় আর থাকব। সিঙ্গেল সিট, ডবল সিটের রুম তো পেলাম না।' নিতু মার পাশে থেকে নামতে নামতে বলে, 'চল, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। প্রাইভেট হাসপাতালগুলোতেও আজকাল দম বন্ধ হয়ে আসে।'

মার রুম থেকে বের হতেই দেখি বড় দুলাভাই একটা ছোট কাগজ হাতে নিয়ে রুম নাম্বার মেলাচ্ছেন। হাঁপাচ্ছেন তিনি। আমাদের দেখেই মুখটা হাসি হাসি করার চেষ্টা করে বললেন, 'এটা কয় তলা, আট না নয়?'

'নয় তলা।' আমি বলি।

'এত উঁচুতে রুম নিয়েছো কেন? উঠতে উঠতে জান বের হয়ে যায়।' দুলাভাই শব্দ করে হাঁপাতে থাকেন।

'আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠেছেন নাকি দুলাভাই?'

'হু।'

'কেন?'

'লিফটে চড়তে আমার ভয় লাগে।'

'এটা তো জানতাম না।'

দুলাভাই নিতুর হাতে একটা ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'লিফটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক কাঁপতে থাকে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি লিফটটা ছিঁড়ে পড়ে গেল, আবার লিফটা যখন উপরে উঠতে থাকে তখন মনে হয় লিফটটা বুঝি থামতে পারবে না, ছাদ-টাদ ভেঙে উপরে চলে যাবে। মহা যন্ত্রণা। তার মাঝে কখনো যদি লিফটা একটু কেঁপে ওঠে, তখন আমার বুকের ভেতরটাও থেমে যায়।' দুলাভাই হাঁপাচ্ছেনই।

'ছোটকাল থেকেই আপনার এরকম হয় নাকি?'

'আরে না। ছোটকালে লিফট পাব কোথায়! থাকতাম মফস্বল শহরে, সেখানে ইদানীং দু'একটা লিফট দেখা যায়, আগে তো তার নামই জানতাম না আমরা।' পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছতে মুছতে দুলাভাই বলেন, 'তিন-চার বছর আগে ব্যবসার কাজে মতিঝিলের এক অফিসে গিয়েছি। এগার তলা অফিস। লিফট দিয়ে উঠছি, কয়েক তলা ওঠার পর লিফটটা থেমে যায় হঠাৎ, লিফটের ভেতরটাও অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা সাতজন ছিলাম সেখানে।

একটু পর শুনি, একটা লোক গোঙাচ্ছে। আমি বলি, কী হয়েছে ভাই ? লোকটা বিড়ালের মতো চিঁ চিঁ করে বলে, আমার বুক ব্যথা করছে। যা বোঝার তা বুঝে গেলাম আমি, স্ট্রোক করেছেন লোকটি। মহা বিপদ। লোকটার বুক মালিশ করতে করতে আমি বলি, ভাইজান ভয় পাবেন না, একটু পরেই লিফটটা চলতে শুরু করবে, ভয়ের কোনো কারণ নেই। মন শক্ত রাখুন, সাহসী হোন। লোকটাকে বলছি বটে, কিন্তু আমারই তখন পালপিটিশন অবস্থা। সতের মিনিট পর লিফটটা চলতে শুরু করে। ততক্ষণে লোকটার যায় যায় ভাব। পরে লিফট থেকে নেমে জানতে পারি, কারেন্ট চলে যাওয়ার জন্য এমন হয়েছিল আর ওদের জেনারেটরটাও নাকি নষ্ট ছিল। তারপর থেকে এমন একটা ভয় ঢুকে গেছে, লিফটের কথা শুনলেই দম আটকে আসে।' দুলা ভাই একটু থেমে বলে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি কেন, চলো ভেতরে চলো। মা কেমন আছে নিতু ?'

'বুঝতে পারছি না।' রুমের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে নিতু বলে, 'সেই সকাল থেকে ঘুমাচ্ছে।'

দুলাভাইকে চেয়ার এগিয়ে দেই আমি। চেয়ারে বসতে বসতে দুলাভাই বলেন, 'ডাক্তার কী বলেছে ?'

'এখনো তেমন কিছু বলছে না।'

'ঠিক আছে, আমি কথা বলে দেখব।' দুলাভাই নিতুর হাতের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওর ভেতর কিছু ফল আছে, মাকে ডেকে খেতে দাও। বিকেল হয়ে গেছে তো, একটু পরই সন্ধ্যা হবে।'

'মা তো কিছুই খেতে পারে না দুলাভাই।'

'বলো কী!' দুলাভাই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার কাছে এসে মার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখানে ভালো চিকিৎসা না হলে মাকে বাইরে নিয়ে যাব আমি। তোমরা টাকার কথা চিন্তা করবে না। সব টাকা আমি দেব। মা মারা গেলে দুনিয়া থেকে আমার সব চলে যাবে।' দুলাভাই হা হা করে কেঁদে ওঠেন, দুলাভাইয়ের কান্না দেখে নিতুও চিৎকার কেরে কেঁদে ওঠে। কান্না হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো, আমার চোখ দিয়েও টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে।

মার প্রতি দুলাভাইয়ের অসীম একটা দায়বদ্ধতা আছে। অবশ্য দুলাভাই নিজেই এটা বলে বেড়ান। মাদের গ্রামের এক পাড়াতো ভাইয়ের ছেলে দুলাভাই। খুবই গরির ঘরের ছেলে। মা একদিন নানার বাড়িতে বেড়াতে গেছে, সে সময় দুলাভাই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন, কিন্তু পরীক্ষার ফিস দেয়ার সামর্থ্য নেই দুলাভাইয়ের বাবার। মা এটা জানতে পেরে দুলাভাইদের বাসায় গিয়ে পরীক্ষার

ফিসের টাকা দিয়ে আসেন। দুলাভাই ম্যাট্রিক পাশ করেন, ইন্টার পাশ করেন, অনার্স করেন, মাস্টার্স করেন এবং এক সময় স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশেও যান পড়াশোনা করতে। এ সবই হয়েছে মায়ের টাকায়। মার অনেকগুলো গয়নাও বিক্রি করতে হয়েছে এতে।

দুলাভাই সবই মনে রেখেছে এসবের। বিদেশে লেখাপড়া শেষ করেই একটা বড় চাকরি পেয়ে যান সেখানে। কিছুদিন সেটা করে দেশে চলে আসেন, এখানে এসেও বড় একটা চাকরিতে যোগ দেন। একদিন এটাও ভালো লাগে না। দাসত্ব নাকি ভালো লাগে না দুলাভাইয়ের, ব্যবসা শুরু করেন। ভাগ্য ভালো হলে যা হয় আর কি, দু বছরের মধ্যেই দুলাভাই বড় লোক হয়ে যান। তারপর বড় আপার সঙ্গে বিয়ে।

দুলাভাই একদিন জানতে পারেন তাকে পড়াতে গিয়ে মার কিছু গয়না বিক্রি করতে হয়েছে, সেদিন তিনি পুরো পঁচিশ ভরি সোনা কিনে এনে মার হাতে দিয়ে বলে, 'মা, এগুলো আপনার জন্য।' সোনার ভরি তখন ছয় না সাড়ে ছয় হাজার টাকা ছিল।

মা ভারী প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে, 'কী আছে এখানে?'

দুলাভাই হাসতে হাসতে বলেন, 'খুলেই দেখুন না, মা।'

মা প্যাকেটটা খোলে এবং খুলেই চমকে উঠে বলে, 'এত গয়না কেন এনেছ তুমি?'

দুলাভাই আগের মতোই হেসে হসে বলেন, 'কোনো কারণ নেই মা, আপনি পরবেন সেজন্য এনেছি।'

মা শব্দ করে বলে, 'এটা কী করেছ তুমি!'

দুলাভাই মার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'মা, আমার মা তো সেই কবেই মারা গেছে, ছোটকালেই মা-হারা হয়েছি আমি। এখন তো আপনিই আমার মা। আপনাকে ছাড়া আমি কাকে দেব এসব। আপনার ঋণ কি আমি কখনো শোধ করতে পারব?'

মা প্যাকেটটা বন্ধ করতে করতে বলে, 'এত খরচ করেছ তুমি!'

দুলাভাই কিছুটা শরমিন্দা হয়ে বলে, 'মা, আল্লার রহমতে আর আপনাদের দোয়ায় এ টাকাগুলো আমি একদিনই কামাই করতে পারি।'

মা সেই যে দুলাভাইয়ের দেওয়া সোনার প্যাকেটটা আমাদের মোটা সেগুন কাঠের আলমারিতে তুলে রেখেছে, তারপর আর একদিনও খুলে দেখে নি সেটা। মাঝে মাঝে প্যাকেটটা বের করে যত্ন করে মুছে তুলে রাখে আবার।

সাদা অ্যাপ্রোন পরা একটা নার্স এসে ঢোকেন রুমে। ঢুকেই কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'আপনারা এত মানুষ কেন রুমে ? রুম তো সাফাকেটেড হয়ে গেছে। একটা ইনজেকশন দিতে হবে রুগিকে। যান যান, রুমের বাইরে যান আপনারা।'

রুমের বাইরে এসে দুলাভাই বললেন, 'বিকেলে তোমরা কিছু খেয়েছ ? তোমাদের চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে কিছু খাও নি। চলো, এখানে বোধহয় ভালো একটা ক্যান্টিন আছে। আমারও চা খেতে ইচ্ছে করছে খুব। নাস্তা করার পর তোমাদের আর থাকার দরকার নেই, তোমরা বাসায় চলে যেও, তোমাদের নাকি সন্ধ্যায় কি একটা মিটিং আছে। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আসছি।'

'বড় আপা এসেছে নাকি দুলাভাই ?'

'হ্যাঁ, মিটিংয়ের কথা শুনেই তো আসল। অথচ মা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা শুনে আমি সেদিনই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্ত তোমার আপার নাকি সময় নেই। কিন্তু আজ মিটিংয়ের কথা শুনেই আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে এল তোমার আপা। তোমরা জানো নাকি— আজ কিসের মিটিং ?'

'না, দুলাভাই।'

দুলাভাই আমার দিকে তাকান, 'অনি, আজকাল তুমি কথাবার্তা একটু কম বলো বোধহয় ?' তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'প্রতিবার শীত এলেই তো তুমি অন্যরকম হয়ে যাও, এবার হয়েছিলে নাকি ?' দুলাভাই আমার পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'ভাবছি, তোমাকে নিয়ে একবার বিদেশে যাব, ভালো একটা ডাক্তার দেখানো দরকার তোমাকে।'

চোখে পানি এসে যায় আমার আবার। বড় বড় দু দুটো ভাই আছে আমার, তারা কখনো আমাকে এ বিষয়ে কোনো কথা বলে না, আমার শরীর খারাপ হলে কখনো জিজ্ঞেসও করে না, অনি, তুই কেমন আছিস! আর রক্তের কেউ না হয়েও দুলাভাই কিনা—।

নিতু আমার বুকে মাথা রেখে জাপটে ধরে বলে,'ভাইয়া, তুই এমন করলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি একদিন বিষ খাব।' ঝরঝর কেঁদে ফেলে নিতু। ওর চোখের জলে বুক ভিজে যায় আমার।

হাপাতালের বাইরে এসে নিতু খুব আদুরে গলায় বলল, 'আজ ক্যাবে যাব না, রিকশায় করে যাব।'

'অনেক দূর তো, কমপক্ষে এক ঘণ্টা লাগবে।'

'লাগুক।'

'ভাইয়া না বলল, সন্ধ্যায় বাসায় থাকতে।'

'আমাদের ছাড়া যদি মিটিং শুরু হয়, হোক। আমি আজ রিকশাতেই যাব।' নিতু কেমন যেন গো ধরে।

রিকশাওয়ালারা যেতে চায় না অতদূর, শেষে ডবল ভাড়া দিয়ে একজনকে স্বীকার করানো হলো, তবে একটা শর্তে। অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পর সে এক কাপ চা খাবে রাস্তার পাশের কোনো দোকান থেকে, সে নাকি দুপুরের পর এক কাপ চা-ও খায় নি, তার খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে।

বয়স অল্প রিকশাওয়ালাটার। মনের আনন্দে রিকশা চালাচ্ছে সে। কিছুদূর যাওয়ার পর নিতু বলল, 'পুষিকে তোর কেমন লাগে ভাইয়া?'

'পাগলির মতো লাগে।'

'ও যে তোকে খুব পছন্দ করে, এটা জানিস?'

'আমাকে অনেকেই পছন্দ করে।'

'আরে গাধা, এ পছন্দ সে পছন্দ না।' নিতু একটু বিরক্ত হয়ে বলে, 'ও তোকে অন্যরকম পছন্দ করে, এটা বুঝিস?'

নিতুর দিকে গভীর চোখে তাকাই আমি। নিতু অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল, ঘুরে ও আমার দিকে তাকায়। ওর ছেড়ে দেওয়া কিছু চুল আমার মুখে এসে ঝাপটা দেয়। আমি সেই চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলি, 'এটা না বোঝার কোনো কারণ আছে?'

'খুব সরল একটা মেয়ে।'

'পাগলের মতো।'

'তুই কি ওকে নিয়ে কিছু ভাবিস?'

'ভাবব না কেন?'

নিতু হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'কী ভাবিস?'

আমি খুব স্বাভাবিকভাবে বলি, 'এই মেয়েটাকে কবে ঠাস করে গালে একটা থাপ্পড় দেব, তারপর ঘাড় ধরে বের করে দেব বাসা থেকে।'

'কী!' নিতু চোখ বড় করে অবিশ্বাস্য স্বরে বলে, 'এটা তোর মুখের কথা, না মনের কথা?'

'মানুষ মন দিয়ে কথা বলে, না মুখ দিয়ে কথা বলে?' নিতুর দিকে তাকাই আমি। তারপর খুব নরম স্বরে বলি, 'যাই হোক, এটা সত্যিকারের কথা।'

'ভাইয়া—।' নিতু আমার একটা হাত খামচে ধরে বলে,'তুই এত ভণিতা করতে পারিস না!' নিতু শব্দ করে হাসতে থাকে।

'হাসছিস কেন ?'

'এমনি।' নিতু অন্যদিকে মুখ ঘুরায় এবং আরো শব্দ করে হাসতে থাকে। তারপর হঠাৎ রিকশাওয়ালাকে বলে, 'কী রিকশাওয়ালা ভাই, পথের অর্ধেক তো চলে এসেছেন, চা খাবেন না ?'

'না, আপা।'

'কেন ?'

'না থাক, আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।'

'না, দেরি-টেরি হবে না। সামনে গিয়ে একটা দোকান দেখে আপনি রিকশা থামান। আমরাও চা খাব আপনার সঙ্গে।'

'আপনারা চা খাবেন ?'

নিতু মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, আপনি যদি খাওয়ান তাহলে খাব।'

রিকশাটা আরো জোরে চালায় রিকশাওয়ালাটি। কিছুদূর গিয়েই বামে একটা সাইড দেখে রিকশা থামায় সে। তারপর বলে, 'আপনারা নামবেন, না রিকশায় বসেই চা খাবেন।'

নিতু নামতে নামতে বলে, 'চা যখন খাব, তাহলে নেমেই খাব।' নিতু নেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভাইয়া, খাবি না তুই ?'

'না, আমার চা খেতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'ইচ্ছে না করলেও নাম। আমি একা একা চা খাব নাকি, মানুষজন কী ভাববে! তোর খেতে ইচ্ছে না করলে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাক।'

ফুটপাতের পাশের একটা দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে নিতু, সঙ্গে রিকশাওয়ালাও। নিতুর মতো একটা মডার্ন মেয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে তাই দেখে ছোটখাটো একটা ভিড় হয়ে গেছে চারপাশে। আমি মিটিমিটি হাসছি। নিতু প্রথমে ব্যাপারটা খেয়াল করে নি, একটু পর খেয়াল করতেই দেখে আশপাশের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেল সে।

নিতু তড়িঘড়ি করে চা শেষ করে দাম দিতে নিতেই থমকে গেল। রিকশাওয়ালা ছেলেটা ঝট করে দোকানদারের দিকে নিতুর টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিয়ে জিভ কেটে ছেলেটা বলল, 'স্যরি আপা, আমি আসলে আপনার হাত ধরতে চাই নি। চায়ে চুমক দিচ্ছিলাম, এরই মধ্যে আপনি চায়ের দাম দিতে চাচ্ছেন, এটা তো কথা ছিল না আপা, তাই উপায় না দেখে আপনার হাতে একটু বাধা দিয়েছি।'

'চা'র দাম আপনি দিতে চাচ্ছেন ?'

'সেটাই তো কথা ছিল আপা। গরিব মানুষ হয়েছি ঠিকই, কিন্তু অত গরীব না, চা'র দাম অন্তত দিতে পারব।' লুঙ্গির গিঁট থেকে টাকা বের করে দোকানদারের দিকে বাড়িয়ে দিল রিকশাওয়ালাটি। তারপর হাতের স্টিলের বেল্টের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপা, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে আপনাদের। চলেন চলেন।'

রিকশায় চলার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে যেন শিস বাজাল। রিকশাওয়ালা ছেলেটি শিসকারীর উদ্দেশ্য ছোটখাটো একটা বাজে কথা বলে বলল, 'আপা, আজকের দিনটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে।'

'কেন আপনি আমাকে চা খাইয়েছেন বলে ?'

'না।'

'তাহলে ?'

রিকশাওয়ালাটি শরমিন্দা মুখে বলে, 'জীবনে তো কোনো মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে চা খাই নি, কিন্তু আজ খেয়েছি।'

আরো জোরে রিকশাটা চলতে থাকে। আর নিতু হাসতে থাকে মুখে ওড়না চেপে।

বাসায় ঢুকতে নিয়েই দেখি বড় মামা বের হচ্ছেন। হন হন করে তিনি আমাদের বাসা থেকে বের হচ্ছেন। মাথা নিচু করে আসছিলেন, আমাদের দেখতে পাননি তিনি। আমি আর নিতু সামনে দাঁড়াতেই মামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'পারুকে দেখতে যাচ্ছি আমি। মনে অনেক কষ্ট পেলাম বাবা, আজ কয়দিন ধরে আমার বোনটা হাসপাতালে আর তোমরা কেউ আমাকে খবরটা জানালে না !'

'স্যরি মামা, আমি আর নিতু মাকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম।'

'আর অন্যেরা ?'

'অন্যেদের কথা তো জানি না মামা।' আমি মামার একটা হাত ধরে বলি, 'চলেন, বাসায় চলেন।'

'বাসায় কেন, পারুকে দেখতে যাব না ?'

'এখন তো যেতে পারবেন না মামা। এই হাসপাতালটা অন্যরকম, সন্ধ্যার পর রোগীর কাছে কাউকে যেতে দেয় না, রাতে কাউকে থাকতেও দেয় না সেখানে।' মামাকে বলি আমি।

'তোমার মা এখন কেমন আছে ?'

'বুঝতে পারছি না মামা। ডাক্তার তো তেমন কিছু খুলে বলে না। তবে বড় দুলাভাই আছেন ওখানে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বাসায় আসবেন তিনি। বোধহয় তখন কিছু জানা যাবে।'

হো হো করে কেঁদে ওঠেন মামা।

আমাদের বড় মামা অদ্ভুত ধরনের একজন মানুষ। তার সকালটাই শুরু হয় অন্যের উপকার করে। ঘুম থেকে উঠে আশপাশের দু-এক গ্রাম তিনি ঘুরে বেড়ান। কার ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার ফিস নেই, কে মেয়ে বিয়ে দিতে বিয়ের অনেক কিছু জোগাড় করতে পারছে না, কাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, কাকে ওষুধ কিনে দিতে হবে, এসব ছাড়াও যে কোনো একটা উপকার সেরে তিনি বাসায় ফেরেন। বাসায় ফিরেই প্রতিটা মানুষের দুর্দশার বর্ণনা করেন আর শব্দ করে কাঁদেন।

মামাকে জড়িয়ে ধরি আমি। মামা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'জরুরি একটা কাজে এসেছিলাম, কাজটা সেরেই চলে যাব। কিন্তু কাজটার কথা কাকে যে বলব বুঝতে পারছি না। তোমরা মা-ও নেই, হাসপাতালে। আর কারো সাথে তো কথা বলে আরাম পাই না।' মামা নিতুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'মারে, তুমি বাসার ভেতর যাও, আমি অনিকে নিয়ে এই সামনে থেকে একটু ঘুরে আসি।

সামনের একটা হোটেলে চা খেতে মামা বলেন, 'নিতুর জন্য একটা বিয়ের সমন্ধ এনেছি। ছেলেটো ভালো, উচ্চ বংশীয়, ভালো চাকরিও করে। তবে ছেলের একটা ছোট সমস্যা আছে, ছেলে দেখতে একটু কালো। তবে সেটাকে ঠিক কালো বলা যাবে না, শ্যামলা।'

'গায়ের রঙ কোনো সমস্যা না মামা।'

'আমিও সেটা বলি। ওই যে কী একটা কবিতা আছে না— কালো আর ধলো বাইরে কেবল ভেতরে সবারই রাঙা।' মামা শব্দ করে হেসে ওঠেন।

মামার আরেকটা বিষয় হলো— মামা যখন তখন কাঁদতে পারেন, যখন তখন হাসতে পারেন। এই হয়তো দুঃখে তিনি ঝরঝর করে কাঁদছেন, পরক্ষণেই ঠিক হাসির না, সামান্য একটা ঘটনাতেই তিনি হো হো করে হাসছেন। কান্নার শব্দ আর হাসির শব্দ সাধারণত আলাদা হয়, কিন্তু মামার দুটোর শব্দ প্রায়ই একই হয়।

'আর একটা কথা—।' মামা চায়ের চুমক দিয়ে বলেন, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ছেলের সঙ্গে নিতু মার মানাবে ভালো।'

'আপনি দেখেছেন ছেলেটাকে?'

'বাবা, এটা তুমি কী বললে! কোনো ছেলেকে ভালো করে না দেখে, তার সম্বন্ধে ভালো করে খোঁজ না নিয়ে আমি কি এখানে আসি? যার তার তো বিয়ে না, আমার ভাগিনীর বিয়ে, খোঁজ-খবর নিতে হবে না আমাকে। শোনো—।' মামা আবার চায়ে চুমক দিয়ে বলেন, 'তোমাকে আরেকটা কথা বলি— কয়েকদিন আগে আমার কাছে একটা খবর এলো একটা ভালো ছেলে নাকি আছে নন্দী গ্রামে। নন্দী গ্রাম হচ্ছে আমাদের গ্রামের দু'গ্রাম পরের গ্রাম। আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রওনা দিলাম সেখানে। কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনি, ছেলে এসেছিল কিন্তু সে আবার চাকরিস্থল শহরে চলে গেছে। ঠিকানা নিয়ে ওখান থেকে আর বাড়িতে না ফিরে সোজা চলে যাই শহরে। ছেলের অফিসে গিয়ে তাকে দেখতেই আমি বুঝতে পারি আমার চেষ্টা বৃথা।'

'কেন মামা?'

খালি কাপে চুমক দেন মামা। তাই দেখে আমি বলি, 'আরেক কাপ চা দিতে বলি মামা?'

'বলবে? বলো। শহরে বাড়িঘরগুলো ছোট হয়ে এসেছে, মানুষের মনও ছোট হয়ে এসেছে, চায়ের কাপও ছোট হয়ে এসেছে।' মামা হাসতে থাকেন হোটেল কাঁপিয়ে, 'সেই কাপে যা চা দেয় তা দু চুমুকেই শেষ হয়ে যায়। তা যা বলছিলাম, আমার চেষ্টা বৃথা কেন? ছেলে খাটোও না বেটেও না, কালোও না, মোটাও না— লম্বা। এত লম্বা, সারা গায়ে কোনো মাংস নেই, মনে হয় একটু বাতাস গায়ে লাগলেই কাত হয়ে পড়ে যাবে।' মামা আবার হাসতে থাকেন।

বেয়ারাকে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আমি বলি, 'এবারের ছেলেটার সামান্য কালো হওয়া ছাড়া তো কোনো সমস্য নেই মামা, না?'

'না, আমার চোখে আর কোনো সমস্যা ধরা পড়ে নাই।'

'তাহলে আর সমস্যা কী?'

'সমস্যা আছে।'

টেবিলে চা চলে এসেছে। আমি কাপটা মামার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি, 'কী সমস্যা মামা?'

'তোমার বড় দু বোন, মানে রিতা আর পারভীনকে তো আমিই বিয়ে দিয়েছি। রিতার বর অবশ্য তোমাদের আগেই পরিচিত ছিল। তোমার মা তার জন্য অনেক কিছু করেছে, ছেলেও ভালো। আমি একদিন বললাম, ছেলে ভালো, উচ্চ শিক্ষিত, সবকিছু জানিও তার, হাতের কাছে থাকা এমন একটা ছেলেকে হাত ছাড়া করছি কেন আমরা? তোমার বাবা তখন বেঁচেছিলেন, তিনি অবশ্য প্রথমে রাজি হন নি। বলেছিলেন, একটা ছেলের জন্য কিছু একটা করা হয়েছে, তার সঙ্গে আবার মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে, মানুষ ভাববে কি? আমি তখন বলেছিলাম, ভাবাভাবির কী আছে, মানুষ এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয় না? অনেক যুক্তি দেখানোর পরেও তোমার বাবা রাজি হন না। বহু কষ্ট করে রাজি করানো হয়েছিল তাঁকে।' মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'একটু চিনি দিতে বলো তো বাবা। এখানে দেখি চায়ে চিনি দিতেও কার্পণ্য করে!'

চায়ে এক চামচ চিনি মেশানোর পর মামা বলেন, 'পারভীনের বিয়েটা আরো একটু ভালো দিতে পারতাম।'

'খারাপ তো কোনো কিছু দেখছি না মামা।'

'না, খারাপ তেমন কিছু না, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ভদ্র। সবই ঠিক আছে, কিন্তু বিদেশে চাকরি করে। স্বামী থাকে বিদেশে, স্ত্রী দেশে— সংসারটা কেমন এলোমেলো হয়ে যায় না!'

'দুলাভাই বোধহয় আর দু-একটা বছর সময় নেবে। তারপর আপাকে নিয়ে যাবেন। তখন অসুবিধা হবে না মামা।'

'না, তখন অসুবিধা হওয়ার কথাও না। আমার এখন একটাই চিন্তা— নিতুর বিয়েটা যেভাবেই হোক শেষ করা। তারপর মরেও শান্তি।'

মামা আমাদের বাড়িতে সাধারণত আসেন না। মানুষের উপকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে তিনি কারো বাড়িতে তেমন যানও না। যদিও কোথাও যান তাহলে ঝুঝতে হবে কোনো একটা জরুরি প্রয়োজনে তার এই আগমন। প্রয়োজনটা মামার না, যাদের বাড়িতে এসেছেন তাদের।

মামা যতবারই আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই— বিয়ে। আমাদের সবার তিনি বিয়ে নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং করছেন। যদিও দু ভাইয়া বিয়ে করেছে যার যার পছন্দ মতো। মামার এখনকার চিন্তা— আপাতত নিতুর বিয়ে দেওয়া। তার এক কথা— বাপ মরা এই মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে তিনি তারপর মরবেন।

হোটেল থেকে বের হয়ে আসি আমরা। চুপচাপ কিছদূর হেঁটে আসার পর মামা স্বগক্তির মতো বলেন, 'কতজনের ছেলে-মেয়েকেই তো বিয়ে দিলাম, কিন্তু আল্লাপাক আমাকেই কোনো ছেলে-মেয়ে দিল না। না না-।' মামা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমার মামির চেহারার দিকে তাকানো যায় না। বেচারি সারাদিন একা একা এটা ওটা করে সময় কাটায় আর হা-পিত্যেস করে।' কথাটা শেষ করেই মামা শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। মামা তো অনেক সময়ই কাঁদেন, কিন্তু তার এ মুহূর্তের কান্নাটা কেমন যেন করুণ শোনায়, চোখে পানি এসে যায় আমারও।

বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মেজ ভাইয়া বললেন, 'কোথায় ছিলি তুই, সকালে তোকে বললাম না মিটিং ডেকেছি একটা ! সবাই আছে, কেবল তুই নেই।'

নিতু পাশের ঘর থেকে এসে মামাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'মামা, আপনি খেয়ে-দেয়ে আপনার প্রিয় কোনার রুমটাতে বিশ্রাম নিন, কিছুক্ষণ পর আমি আর অনি ভাইয়া এসে আপনার সঙ্গে গল্প করব।'

'এত সকালে খাব ?'

'এত সকাল কই মামা, সন্ধ্যা পার হয়েছে সেই কখন। আমি তো শুনেছি রাতের খাবারটা আপনি নাকি একটু আগেই খান।'

'হ্যাঁ মা। গ্যাস্ট্রিক আছে তো। তাছাড়া বুড়ো হয়েছি না, কত রকম জটিলতা শরীরে, খাবার-টাবার তেমন হজম হতে চায় না আজকাল। তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে

কিছুক্ষণ হেঁটে তারপর ঘুমাই আর কি।' মামা নিতুর দিকে দ্বিধা নিয়ে তাকিয়ে বলেন, 'আজ না হয় একটু দেরিতেই খাই। তোমরা খাবে না, তোমাদের সঙ্গে খাই।'

'আমাদের অনেক দেরি হবে মামা, ততক্ষণে আপনার একপ্রস্থ ঘুম হয়ে যাবে। চলুন চলুন।' মামাকে প্রায় জোর করে ডাইনিং রুমে নিয়ে যায় নিতু।

কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতেই আমি নিতুকে বলি, 'মামাকে কৌশলে সরিয়ে দিলি না?'

দুঃখী দুঃখী চোখে নিতু আমার দিকে তাকায়। আমি ওর একটু কাছ ঘেঁসে দাঁড়াই। দুঃখী দুঃখী চোখের চেয়ে দুঃখী দুঃখী গলায় ও বলল, 'আজ কী নিয়ে মিটিং হবে এটা বোধহয় আমি বুঝতে পারছি রে ভাইয়া। আমার একদম এ মিটিংয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

নিতুর মাথায় একটা হাত রাখি আমি, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করি না ওকে। আমারও শুনতে ইচ্ছে করে না ও কী বুঝতে পেরেছে। বড় আপা শব্দ করে হেঁটে এসে এ ঘরে ঢুকে বলে, 'তোরা এখানে, আমি তোদের খুঁজে খুঁজে হয়রান। কতদিন পর তোদের এখানে এলাম, আর তোদের দেখাই নেই। চল চল, সবাই বসে পড়েছে।'

ড্রইংরুমে সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছে। আমরা ঢুকে বসতেই মেজ ভাইয়া একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'আজকের মিটিংটা মাকে নিয়ে। আমরা যতদূর জানি, মা আর বাঁচবে না।'

নিতু খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'জানা যায় না?' মেঝ ভাইয়া সবার দিকে তাকিয়ে সমর্থনের আশায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি লাগে নাকি! মা তো এই দু মাসে প্রায় আট-দশ বার অসুস্থ হলো, এবার দিয়ে চার বার হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো। শুনেছি, অবস্থা আরো খারাপ।'

মাথা নিচু করে ছিলাম আমি। মেজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলি, 'মার অবস্থা খারাপ, এটা তুমি কার কাছে শুনেছ?'

'শুনেছি...।' মেজ ভাইয়া অসমাপ্ত কথাটা বলে আবার সবার দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তাকায়।

'মা আজ কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে, তোমাদের সবার এত ব্যস্ততা, তোমরা কেউ-ই মাকে একবার দেখতে গেলে না, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললে না, কিন্তু জেনে গেলে মার অবস্থা খারাপ!'

'এবার না যাই, এর আগে তো প্রত্যেকবার গিয়েছি।' মেজ আপা কিছুটা চিৎকার করে বলে।'

নিতু আগের মতোই ঠাণ্ডা মাথায় একটু জোর দিয়ে বলে, 'আপু, এটা আমাদের পারিবারিক মিটিং, কথায় কথায় চিৎকার করবে না। আর শোনো, এর আগে মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছ মানে কি এবার যাওয়া যাবে না ? এতই ক্লান্ত হয়ে গেছ তোমরা!'

'ওই ছেমরি, তুই এভাবে কথা বলছিস কেন ?' মেজ আপা আবারও চিৎকার করে বলে।'

'আপা, তুমি অভদ্রতার পরিচয় দিচ্ছ, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।'

'কী, আমি অভদ্রলোক!'

'আমি সেটা মিন করি নি। তবে আমি এটা জানি, বিয়ের পর কোনো ভদ্র মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে প্রায় সারা বছর বাপের বাড়ি পড়ে থাকে না।'

বড় ভাবি মুখ টিপে হেসে ফেলেন। কারণ মেজ আপার সঙ্গে বড় ভাবির সম্পর্ক অন্যরকম, ওরা কেউ কারো সঙ্গে তেমন কথা বলে না, তবে একসঙ্গে বসে হিন্দি সিরিয়াল দেখে।

বড় ভাইয়া একটু শব্দ করে বলে, 'তোরা দেখি ঝগড়া শুরু করে দিলি।' মেঝ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বড় ভাইয়া বলে, 'শফিক, তুই যা বলছিলি বল। সম্ভবত আজ অনেক সময় লাগবে মিটিংটা শেষ করতে।'

'হ্যাঁ।' মেজ ভাইয়া আবার সবার দিকে তাকিয়ে বড় ভাইয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কথাটা বলতে খুব রূঢ় শোনাবে— আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মা আর এবার বেঁচে ফিরে আসবে না। কিন্তু তারপর ?'

মেজ ভাইয়ার দিকে তাকাই আমি। মেজ ভাইয়াও আমার দিকে তাকায়। আমি যথা সম্ভব নিজেকে স্থির রেখে বলি, 'তারপর আবার কী ?'

'মার নামে বাবা অনেকগুলো টাকা ফিক্সড করে রেখে গেছেন, এ টাকাগুলোর কী হবে ?'

'কী হবে মানে কী, আমরা সবাই ভাগ করে নেব টাকাগুলো।' বড় আপা বেশ উৎসাহী হয়ে বলে।

'অনেক সোনাও তো আছে।'

'সেগুলোও ভাগ হবে।' বড় আপা আবার বলে, 'অবশ্য অনেক সোনা আমার স্বামীরই দেওয়া।'

নিতু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। কাঁপতে থাকে ও, 'তোমরা কী, তোমরা মানুষ ভাইয়া! মা এখনো বেঁচে আছে, আর তোমরা এখনই ভাগাভাগি শুরু করে দিলে! আমার ঘৃণা লাগছে ভাইয়া, প্রচন্ড ঘৃণা লাগছে। ছিঃ!'

'তুই তো এখন চিল্লাচ্ছিস।' মেঝ আপা টানটান করে সোজা হয়ে বসে বলে, 'মার প্রতি যেন তোরই দরদ বেশি, আমাদের নাই।'

'আপা, তোমাকে অনেক সহ্য করা হয়েছে। আর না, একটা মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়িই তার বাড়ি, সুতরাং এখনো এটা আমার বাড়ি। আর একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর বাড়িই তার বাড়ি। আমাদের সমাজে এটাই প্রচলিত। তুমি যদি আর একটা কথা বলো, তোমাকে এ বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। তোমার লজ্জা করে না, বিয়ের পরও বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতে! এখানে থেকে সারাদিন ফিসফিস করো আর শয়তানি বুদ্ধি বের করো। তোমার জন্য, এই তোমার জন্যই আজ এই সংয়ের মিটিং। তুমি, মেজ ভইয়া, মেজ ভাবী মিলে এই মিটিংটা ডেকেছ, আর আমার গুণধর বড় ভাই আর বড় ভাবি তাতে সমর্থন যুগিয়েছ, যে ভাবি নারীর কল্যাণ নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু হাসপাতালে মৃত প্রায় শাশুড়িকে দেখতে যায় না।'

কাঁপতেই থাকে নিতু, আমি ওকে জড়িয়ে ধরি। ও আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'তুই একটা গাধা, মনে মনে যত কষ্ট পাস, কিন্তু কাজের বেলা ঠন ঠনা ঠন।' তারপর দৌড়ে এসে জাপটে ধরে আমাকে বলে, 'আমিও তোর মতো পাগল হয়ে যাচ্ছি রে ভাইয়া।'

বড় মামা কখন ড্রইংরুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা টেরই পাই নি। হা হা করে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বুক চাপড়ান আর বলেন, 'আল্লা, তুমি আমারে যা শোনাইলা ভালোই শোনাইলা, কিন্তু আমার সহজ-সরল বোনটারে এগুলো শোনাইও না। ও তাহলে বাঁচবে না।'

মামা আস্তে আস্তে নিচু হয়ে পড়ে যান এবং মেঝের ওপর শুয়ে পড়েন চিৎ হয়ে। অজ্ঞান হয়ে গেছেন মামা।

ফুপুর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সাত সকালেই তিনি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আমার রুমের সামনে এসে বেশ শব্দ করে বললেন, 'কিরে, সকাল হয়েছে কখন আর তোদের বাড়িতে দেখি এখনো গভীর রাত, সবাই আরাম করে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।'

নিতু ঘুমজড়িত গলায় বলল, 'অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়েছে তো।'

'তোরা সবাই রাত করে ঘুমাস নাকি?'

'না। কালকে একটু দেরি হয়ে গেছে।'

'অনি ওঠে নি।'

'অনিও অনেক রাতে ঘুমিয়েছে। ফুপু আপনি বসুন, ওকে ডেকে দিচ্ছি আমি।' নিতু আমার দরজার দিকে এগিয়ে আসছে, অমি ওর পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

রুম থেকে বের হয়ে এলাম আমি। মাথাটা অল্প অল্প ঘুরাচ্ছে, ঘুম হওয়া দরকার আরো। ফুপু আমাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'আজ তোর হাতে কাজ কী?'

'কয়দিন ধরে তো কোনো কিছু করছি না ফুপু। মা হাসপাতালে, মাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়াও হচ্ছে না, যেতেও চাচ্ছি না।'

'সকালে ভাবীর জন্য খাবার নিয়ে যাবি তো?'

'হ্যাঁ।'

'তার আর দরকার হবে না। খাবার আমি নিয়ে এসেছি। তুই এখন হাসপাতালে যাবি তো?'

'হ্যাঁ, খাবার নিয়ে যাওয়ার কথা।'

'আমার সঙ্গে চল। খাবার তো আমি নিয়েই এসেছি। রেডি হয়ে নে।' ফুপু নিতুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোদের কোনো কাজের মেয়ে নেই?'

'কেন ফুপু, আপনার কিছু লাগবে?'

'তোদের নিয়ে হচ্ছে এই একটা সমস্যা, প্রশ্ন করি একটা উত্তর দিস আরেকটা। তুই একা একা কাজ করছিস, সেজন্য বললাম।'

'ফিক্সড কোনো কাজের মেয়ে নেই, ছুটা একটা বুয়া আছে। ইচ্ছে হলে আসে, না হলে আসে না।'

'তোদের বাসায় কি খেঁজুরের গুড় আছে?'

'আছে।'

'আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দেতো, চিনির বদলে গুড় দিয়ে বানিয়ে দিস। দুধ চা না, রঙ চা হবে কিন্তু।'

ফুপু কৌশলে নিতুকে রান্না ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ির এখনো কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। সম্ভবত কেবল মামা উঠেছেন এবং উঠে আশপাশে কোথাও হাঁটতে গেছেন। কারণ মামা যত রাত করেই ঘুমান না কেন, খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন তিনি। অনেকদিনের অভ্যাস।

নিতু রান্নাঘরে চলে যেতেই ফুপু আমার ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঢুকলাম। দ্রুত আমার একটা হাত ধরে ফুপু আমার বিছানায় বসে কিছুটা ফিসফিস করে বলেন, 'তুই তো কাল চলে এলি। তোর সঙ্গে আমার যে জরুরি কিছু কথা ছিল, এটা খেয়াল আছে তোর?'

'কাল তো সেটা শোনার সুযোগ হলো না। ফুপাজান এখন কেমন আছেন ফুপু?'

'ভালো আর থাকে কীভাবে? পাপ আছে না।' ফুপু মুখটা বিকৃত করে বলেন, 'সারা রাত জ্বালিয়েছে। একটু করে শোয়, আবার একটু পর লাফ দিয়ে উঠে বলে, দেখো তো দরজা কেউ টোকাচ্ছে কি-না। আমি বলি দরজায় টোকাবে কেন, আমাদের কলিং বেল আছে না।'

'এ রকম বলার কারণ কি ফুপু?'

'ও দুদক আতঙ্কে ভুগছে। ওর মনে সারাক্ষণ চিন্তা এই বুঝি দুদকের লোক এসে ওকে ধরে নিয়ে যাবে। মহা মুশকিল রে বাপ। শান্তির জন্য এত কিছু করার পর দেখি এগুলো আসলে অশান্তি।' ফুপু আমার আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলেন, 'শোন, তোর কাছে এখন যে কারণে আসা—।' ফুপু আমার দরজার দিকে তাকিয়ে সতর্ক হয়ে বলেন, 'একটা কামেল বাবার খবর পেয়েছি, তার কাছে আমার একটু যাওয়া দরকার।'

'কোথায় থাকেন তিনি?'

'গাজীপুরের ওই দিকে।'

'তার কাছে গিয়ে কী করবেন?'

'বিপদ-আপদ নাকি কাটিয়ে দিতে পারেন তিনি। অনেক লোক নাকি তার কাছে গিয়ে উপকার পেয়েছে।' ফুপু বেশ ভক্তি নিয়ে বলেন।

'কীভাবে বিপদ-আপদ কাটান তিনি ? পানিপড়া দিয়ে, না ফুঁ দিয়ে ?'

'ফুঁ দিয়ে।'

'তাহলে তো ফুপাজানকে নিয়ে যেতে হবে।'

'মুশকিল তো হচ্ছে এখানেই।'

'কেন ?'

'তোর ফুপাজান তো যাবে না। কাল রাতের ওই ঘটনার পর তোর ফুপা কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝরাতের দিকে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ শব্দ করে বলে, আমি কামেল বাবা হয়ে গেছি, আমি এখন সবাইকে পানি পড়া দেব, ফুঁ দেব, যাও যাও লোকজন ডেকে আনো, লোকজন ডেকে আনো।'

'পাগল হয়ে গেলেন নাকি ফুপাজান ?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে।' ফুপু আমার বিছানার ওপর পা তুলে বসেন, 'তারপর কী বলে জানিস ? বলে, আমার গা থেকে সব কাপড় খুলে নাও, আমি নাঙ্গা বাবা হয়ে গেছি।'

মাথায় একটা শয়তানি বুদ্ধি এসে গেল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে হাসি এসে গেল আমার। খুব কষ্টে হাসিটা দমন করলাম আমি। কিন্তু কীভাবে জানি তবুও টের পেলেন ফুপু, 'কি রে হাসছিস কেন ?'

'না তো।'

'আমি এখনো দেখছি হাসছিস, তারপরও না বলে।'

'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে ফুপু।'

'কী বুদ্ধি ?'

'ফুপাজান যদি ন্যাংটো হতে চায় তাকে ন্যাংটো হতে দিন। এতে অবশ্য পুষির বিয়ে দিতে একটু অসুবিধা হবে। সকলে বলবে ন্যাংটা মানুষের মেয়ে। সেটা পরের অসুবিধা, আপাতত সুবিধাটা হলো ফুপাজানের এ রকম পাগলামি কথা জানতে পারলে দুদকের লোকজন ফুপাজানকে কোনো কিছু নাও করতে পারে। ভাববে লোকটা পাগল হয়ে গেছে, থাক।'

গভীর চোখে ফুপু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটি তিনি কীভাবে নিলেন। তবে আমি মনে মনে চাচ্ছি ফুপু আমার বুদ্ধিটা মেনে নিক। অনেকদিন পর একটা প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমার পাগলামির কথা শুনে ফুপাজান অনেকরকমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন আমাদের, বলেছেন পাগলের ফ্যামিলি। এরপর হয়তো তিনি আর বলবেন না, কারণ তিনি নিজেই এখন পাগল।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে ফুপু গম্ভীর গলায় বলেন, 'তুই সিরিয়াসলি বলছিস, না ইয়ার্কি মারছিস ?'

'ইয়ার্কি মারব কেন ফুপু!' আমি ফুপুর চেয়েও গম্ভীর গলায় বললাম, 'এটা কি ইয়ার্কি মারার বিষয় ?

'তুই মাঝে মাঝে কী যে বুদ্ধি দিস না-না ফেলতে পারি, না গিলতে পারি। তোদের সবার মতো আমিও বোধহয় পাগল হয়ে যাব।' ফুপু কান্নার মতো মুখ করে থাকেন।

ফুপু আমাকে দেখতে পারেন না, এটা সত্য। কিন্তু তার যখন কোনো প্রয়োজন পড়ে কিংবা ছোটখাটো বুদ্ধি নিতে হয় তখন তিনি আমাকে স্মরণ করেন। একদিন তিনি আমাকে তার বাসায় ডেকে পাঠালেন।

বাসায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ফুপু কেঁদে কেটে অস্থির হয়ে বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে অনি।'

ফুপু আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন। আমিও ফুপুকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'কী হয়েছে ফুপু, ফুপাজান কি বিয়ে করে ফেলেছেন ?'

'তুই কী করে জানলি!' ফুপু আমাকে খামচে ধরেন।

'আমি জানলাম কী করে মানে! ফুপাজান কি সত্যি বিয়ে করে ফেলেছেন ?' আমি অবাক হয়ে ফুপুর দিকে তাকাই।

ফুপু আবার কাঁদতে শুরু করেন। কাঁদতে কাঁদতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলেন, 'আমার তো মনে হয় বিয়ে করেই ফেলেছে।

'আপনি কী করে বুঝলেন ?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে রাত নাই বিরাত নাই সব সময় ফোনে ফুসুর ফুসুর করে, হাসে, রঙ্গ করে। অসহ্য!'

'আপনি কী করে বুঝলেন ফুপাজান একটা মেয়ের সঙ্গেই কথা বলে।

'একটা মেয়ের সঙ্গে কথা না বললে কি ওভাবে কেউ হেসে হেসে কথা বলে, তাও গভীর রাত পর্যন্ত।' ফুপু রেগে ওঠেন।

'আমার এখন কী করতে হবে ?' আমি ফুপুর দিকে তাকাই।

'তুই আমাকে বুদ্ধি দে আমি এখন কী করব ?'

'আমার বুদ্ধিতে বলে যদি ফুপাজান বিয়ে করে ফেলে তাহলে তাকে সতিন হিসেবে আপনার ঘরে নিয়ে আসা উচিত, যদি না করে থাকেন তাহলে অতিসত্বর তাদের বিবাহ সম্পাদন করে সেই ঘরেই নিয়ে আসা অতীব জরুরি। এতে আপনার নানাবিধ উপকার হবে। এক. ফুপাজান অনেকক্ষণ মোবাইলে কথা

বলেন মেয়েটির সঙ্গে এতে প্রতিদিন তার অনেক টাকা খরচ হয়, মাঝে মাঝে তারা ডেটিং করেন, এতেও চাইনিজ, ফাস্টফুড সব মিলিয়ে অনেক খরচ হয়, এ খরচগুলো আর হবে না, ফুপাজানও বাইরে বাইরে না থেকে বাসায় আপনার কাছাকাছি থাকবেন বেশী বেশি করে। আপনার সবচেয়ে বেশি উপকার হবে কোনো কাজের মেয়ে নেই আপনার, ফুপাজানের জ্বালায় কাজের মেয়ে রাখতে পারেন না আপনি, ওই মেয়েটা বাসায় এলেই তাকে দিয়ে দাসীবান্দির কাজ করাতে পারবেন আপনি ইচ্ছে মতো। হাজার হলেও আপনি এ বাসার বড় বউ, এ সংসারে আপনার অধিকার সবচেয়ে বেশি।' আমি হেসে হেসে বলি, 'কী ভালো বুদ্ধি দিয়েছি না ফুপু?'

ফুপু ভাবলেশহীনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, কিছু বলেন না। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তোর বুদ্ধি শুনে আমার মাথা ঘুরাচ্ছে রে অনি।'

নিতু একটা ট্রেতে করে নাস্তা এনে আমার ঘরে ঢুকতেই ফুপু বললেন, 'তোকে বললাম চা দিতে, আর তুই নিয়ে এলি একগাদা খাবার!'

'সকালের নাস্তা করতে হবে না আপনাকে।' নিতু ফুপুর সামনে খাবারগুলো রেখে বলে।

'না, আজ থেকে ভেবেছি সকালে কিছু খাব না।' ফুপু চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'শরীরটা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে যাচ্ছে।'

'এটা আপনি এতদিনে টের পেলেন ফুপু!'

ফুপু কী বোঝেন বুঝতে পারি না। তিনি আগের মতোই চায়ে চুমক দিতে দিতে বললেন, 'হু, টের পেতে একটু দেরিই হয়ে গেল।' ফুপু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'আমি এখন যাই রে, ভাবিকে খাবারগুলো পৌছে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে বাসায় পৌছতে হবে। জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়েছে। আর তোকে আসল জরুরি কথাটা বলা হয় নি, বিকেলে একটু বাসায় আসিস, তোর কাছে সব কথা আজই শেষ করতে হবে আমাকে।'

ফুপু ঝড়ের মতো চলে যেতেই বড় দুলাভাই দৌড়ে এসে বললেন, 'অনি, কাল রাতে এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি কাল রাতে মাকে দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, ফোন করেছেন তিনি। আমাদের এখনই হাসপাতালে যেতে হবে।'

নিতু মার খাবারগুলো তাড়াতাড়ি রেডি করে নিল, দুলাভাই তার গাড়ির ড্রাইভারকে ডেকে তুললেন ঘুম থেকে, আমি দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে বাইরে আসতেই আমরা সবাই রওনা দিলাম হাসপাতালের দিকে।

ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'রোগীর পালস পাওয়া যাচ্ছে না। রোগীকে ইনসেনটিভ কেয়ারে রাখতে হবে বারো ঘণ্টা। আপনারা তার জন্য দোয়া করুন।'

নিতু আমার দিকে তাকাল, আমি নিতুর দিকে তাকালাম। হঠাৎ ও ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বলল, 'আমি কি মাকে একটু দেখতে পারি ডক্টর ? প্লিজ।'

'স্যরি, তাকে অলরেডি ইনসেনটিভ কেয়ারে ঢুকানো হয়েছে।' ডাক্তার দ্রুত চলে গেলেন।

বড় দুলাভাই এসে আমাদের দু জনের মাথায় হাত রাখলেন। এরকম করে মা রাখতেন হাত আমাদের মাথায়। আইসক্রিম আইসক্রিম বলে চিৎকার চলে যাচ্ছিল আইসক্রিমওয়ালা। আমি আর নিতু কাঁদছিলাম। আমাদের তখন অভাব ছিল; মার গাঁট কিংবা আঁচলে তখন কোনো পয়সা থাকত না। বাবা অফিসে। মা চোখে জল নিয়ে আমাদের মাথায় সেদিন হাত রেখেছিল। মার সেই হাতের স্পর্শেই আমরা আইসক্রিমের স্বাদ পেয়েছিলাম।

বাসার সবাই একে একে হাসপাতালে এসে উপস্থিত। অতি কষ্টের ঘুম ভাঙিয়ে বড় আপাও এসেছে।

মা মারা যাচ্ছে, মা মারা যাবে! মাথার ভেতর কেমন যেন করে ওঠে আমার। নিতুর একটা হাত চেপে ধরি আমি। ও টের পেয়ে যায় আমার ভেতরের পরিবর্তনটা। দুলাভাইকে ফিসফিস কী যেন বলে। দুলাভাই আমাকে চেপে ধরে থাকে। কিন্তু কী একটা অদম্য শক্তি এসে ভর করে আমার শরীরে। দুলাভাইকে ধাক্কা দিয়ে আমি দ্রুত চলে যাই মেজ ভাবির কাছে। তার ডান গালে সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে একটা থাপ্পড় মারি। আমার আর কিছু মনে থাকে না তারপর।

ভয়াবহ কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে বাসায়, সবার মুখ থমথমে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, যার যার ঘরে দরজা প্রায় বন্ধ করে আছে সবাই। কেবল নিতু আমার বিছানার পাশে বসে আছে, আমার একটা হাত চেপে ধরে আছে চুপচাপ।

বেশ কিছুক্ষণ পর শব্দ করে একটা শ্বাস ছেড়ে নিতু বলল, 'মেজ ভাবি তার বাবার বাসায় চলে যাচ্ছিল।'

'তার মানে এখনো যায় নি।'

'না।'

'কে ঠেকাল?'

'বড় দুলাভাই।

'ঠেকানোর কোনো দরকার ছিল না।'

'ছিল।' নিতু একটু ভর দিয়ে বলে, 'ভাবির বাসার লোকজন ব্যাপারটা জানলে আমাদের বদনাম হবে।'

'তার চেয়ে বেশি ওদের বদনাম হবে যদি আমরা ভাবির ব্যাপারটা জানাই।' শরীরের ভেতর কেমন যেন রাগ উঠে আসে আমার।

'তোর কি মনে হয় ভাবির ব্যাপারটা মেজ ভাইয়া জানে?'

'অবশ্যই, আর এর জন্যই ভাইয়া এখনো চুপচাপ আছে। না হলে দেখতিস এতক্ষণ কতরকম বিচার বিশ্লেষণ হয়ে যেত।' আমি বিছানায় উঠে বসে নিতুর দিকে তাকাই, 'আমার কষ্ট হচ্ছে রে, ভাইয়া ব্যাপারটা জেনেও কেমন মেনি বিড়ালের মতো চুপ হয়ে আছে।'

'আমি ছেলে হলে হয়তো আমিও করতাম, তবু কেন যেন মনে হচ্ছে কাজটা তোর ঠিক হয় নি ভাইয়া।'

মাথাটা নিচু করে ফেললাম আমি। নিজেকে একটু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ করে বাবার কথা মনে হয়ে গেল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত জেদি একজন মানুষ। তারা ছিলেন চার ভাই।

স্বাধীনতার পর সেজ চাচা হঠাৎ বড়লোক হয়ে যান। তবে লুট, ডাকাতি, অন্যের সম্পদ কেড়ে নিয়ে নয়, ব্যবসা করে। শুনেছি, চাচা নাকি তোষকের নিচে টাকা বিছিয়ে ঘুমাতেন।

টাকা হলে যা হয় সেজ চাচারও তাই হয়ে গেল। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেলেন চাচা, বেড়ে গেল বুদ্ধিও। সেই ক্ষমতা আর বুদ্ধির জোরে চাচা আরো অনেক কিছু করে ফেললেন। শহরে দাদার একটা জায়গা ছিল, ৩৬ ফুট, খুবই দামি জায়গা, সেই ৩৬ ফুটের অর্ধেক অর্থাৎ ১৮ ফুটের মালিক হয়ে গেলেন চাচা একদিন হঠাৎ করেই। ব্যাপারটা জানতে পেরে বাবা দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন। দাদা রাগী স্বরে বললেন, 'ওর কাছে আমি জায়গা বিক্রি করেছি।'

বাবা বললেন, 'কেন?'

'আমার টাকার দরকার ছিল।'

'আপনার টাকার দরকার সেটা আপনি আমাদের বললেন না কেন?'

'আমাকে কি তোমাদের সব কথাই বলতে হবে?'

'তা বলতে হবে না। কিন্তু কিছু কিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমাদের একটু জানানো উচিত বাবা।'

'আমার মনে হয় নি জানানো উচিত, তাই জানাই নি।'

'থ্যাংক ইউ বাবা। আপনার বিজ্ঞ বুদ্ধি যদি বলে সংসারের কোনো একটা দামি সম্পদ বিক্রি করার ক্ষেত্রে বড় ছেলেসহ অন্যান্য ছেলেকেও জানানো উচিত না, তাহলে আপনি ঠিক কাজই করেছেন।'

আমি তখন পৃথিবীতে আসি নি। সবাইকে নিয়ে বাবা পরের দিন দাদার বাড়ি ত্যাগ করেন এবং আসার সময় বলে এসেছিলেন, এ বাড়িতে তিনি আর কোনো দিন আসবেন না।

বাবা তার কথা রেখেছিলেন। কিন্তু দাদা এসেছিলেন বাবার বাসায়, ততদিনে তিনি তার সব সম্পদ শেষ করে ফেলেছেন তার সেজ ছেলের বুদ্ধির কাছে। দাদা মারাও যান আমাদের এই বাসাতেই। মারা যাওয়ার আগে দাদা নাকি বাবার হাত ধরে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলেন।

বাবার অনেক কিছুই আমি পেয়েছি, জেদটাও। আমার সিদ্ধান্তে যদি বুঝি এ জিনিসটা করা দরকার, একটুও না ভেবে, কোনো কিছু না ভেবে, তাৎক্ষণিকভাবে সেটা করে ফেলি এবং সেটা নিয়ে আমি আর কখনোই ভাবি না।

আমি ভাবছিলাম, নিতু আমাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে, 'সেই তখন থেকে কী ভাবছিস বল তো?'

'কিছু না।'

'কিছু খেতে দেব তোকে।'

'না।'

'পুষি এসেছিল।'

'কখন?'

'তুই তখন ঘুমিয়েছিলি।' বিছানার পাশ থেকে একটা লাল টকটেকে খাম এগিয়ে দিয়ে নিতু বলে, 'এটা দিয়ে গেছে তোকে।'

'কী এটা?'

'এটা কী আমি কি জানি।'

লাল খামটা হাতে নেই আমি, সঙ্গে সঙ্গে নিতু বলে, 'তুই বোস, আমি একটু রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।'

খামটা খুলে ফেলি আমি। একটা চিঠি—

যার জন্য প্রযোজ্য

অনেক দিন পর আজ আব্বু আর আম্মুর সঙ্গে বসে দুপুরে খাবার খেলাম। আব্বুটা না সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কখনো মনে হয় আগের আব্বুই ভালো ছিল, কখনো মনে হয় এখনকার আব্বুটাই ভালো, আবার কখনো মনে হয় কোনোটাই ভালো না। খেতে খেতে আম্মু হঠাৎ কেঁদে উঠে বলে, কতদিন লেমনকে দেখি না। খুব কষ্ট হয় তখন। এই যে আমি আছি, আম্মুর আরেকজন সন্তান আছে, যে ছেলে না হোক মেয়ে তো, মানুষ তো, তার কথা আম্মুর তখন মনেই হয় না। ইনসালটিং!

আমাদের বাসায় যে কয়টা গোলাপ গাছ আছে তার মধ্যে একটার সঙ্গে আমার মনের অদ্ভুত একটা সংযোগ আছে। আমি ভীষণ আশ্চর্যবোধ করি। আমার যখন মন ভালো থাকে তখন ওই গাছটাতে ফুল ফোটে, আর খারাপ থাকলে কোনো ফুলই ফোটে না। বেশ কয়েকবার ব্যাপারটা লক্ষ করেছি আমি এবং প্রতিবারই অবাক হয়েছি।

আর এই মন ভালো-খারাপ থাকাটার সঙ্গে একটা মানুষ এখানে জড়িত, যে মানুষটা আমাকে কখনো বোঝেই না।

অদ্ভুত, তাই না? ভীষণ অদ্ভুত!

ভালোবেসে মেয়েরা সব পারে, অনেকেই জানে। ভালোবাসা কী আশ্চর্য শিহরণ জাগানিয়া শব্দ, না? বোধহয় একটা মনস্তাত্ত্বিক

নেশাও। যে বাসে সে জানে তার ভেতর দিয়ে কী বয়ে যাচ্ছে।

কোনো কোনো দিন মনে হয় অদ্ভুত কিছু কাণ্ড করে বসি আমি। রবীন্দ্রনাথের কোনো এক চরিত্রের মতো সাজব আমি। লাল টকটকে সিঁদুর মাথায়, কপালে টিপ, দু হাত ভরা চুড়ি, ঘাড়ে নেমে আসা খোঁপা, তাতে বেলিফুলের মালা, তাঁতের খাঁটি সুতি শাড়ি, লম্বা হাতা ব্লাউজ, আর কিছু না। না, আরো একটা জিসিন করব আমি, অদ্ভুতভাবে ঠোঁটটা সাজাব আমি।

তারপর ?

তারপর কারো বাসায় গিয়ে হঠাৎ চমকে দিয়ে বলব, চলো তো, আজ আমরা বিয়ে করে ফেলব, আজ আমাদের বিয়ে।

অতঃপর ?

অতঃপর আর কিছু জানি না।

তুমি জানো ?

বি. দ্র : অনি ভাইয়া, তুমি কি ভেবেছ চিঠিটা তোমাকে লিখেছি, তাহলে ভুল করবে। জানো, আমার যা আছে তার বিনিময়ে যদি একটা মানুষ পেতাম, যে আমাকে দেখলেই আমার ভেতরটা পড়ে ফেলবে, আমার সব অজানা বুঝে ফেলবে, তার পায়ের নিচে নিজেকে উৎসর্গ করতাম। হায়! সে মানুষটার খোঁজে আমার সারাজীবন কেটে যাবে।

চিঠিটা পড়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার। নিতু কতগুলো আলুর চপ ভেজে এনে ঘরে ঢুকে আমার সামনে রাখল। তারপর হাতের চিঠি হয়ে দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর স্থির করে পাশে বসে বলল, 'মন খারাপ করা চিঠি ?'

মাথা উঁচু-নিচু করলাম আমি।

আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিতু বলে, 'থাক, আর পড়তে হবে না। মন খারাপ করা জিনিস বেশি পড়তে নেই, সামনেও রাখতে নেই, এমন কি জিনিসটা আস্তও রাখতে নেই।'

ফরফর করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নিতু। আমি অবাক হয়ে ওর চোখের দিকে তাকাই, চোখ টলটল করছে ওর।

বড় দুলাভাই খুক করে কাশি দিয়ে ঘরে ঢুকে বলেন, 'তোমরা দুজনই এখানে আছো। সকালে যা হলো তা আসলে মিটমাট করে ফেলা দরকার। চলো তো, আমি আমার গরজেই সবাইকে ড্রইংরুমে ডেকেছি। সবাই এসেছেন, তোমরাও চলো।'

'আমাদের না গেলে হয় না দুলা ভাই ?'

দুলাভাই আমার হাত টেনে ধরে বলেন, 'ব্যাপারটা আমি মিটমাট করে দেই, চলো। একই বাড়িতে থাকবে আর এর সঙ্গে ও, ওর সঙ্গে সে কথা বলবে না, কেমন দেখায় জিনিসটা। চলো চলো।'

নিতু দুলাভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়, 'তবে একটা কথা দুলাভাই, মেজ ভাবীর কাছে ভাইয়াকে দিয়ে যেন কোনোভাবেই মাফ চাওয়াবেন না।'

'বড়দের কাছে মাফ চাইলে কী হয় ?'

'সম্পর্কের বড় হলেই মানুষ বড় হয় না। মানুষকে বড় হতে তার মননে, ব্যবহারে, শিক্ষায়, আচরণে।'

'এখন এসব কথা রাখো তো, সন্ধ্যার দিকে মার কাছে যেতে হবে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে, যদি সুযোগ হয়ে মাকে নিয়ে আমি বিদেশে যাব।' দুলাভাই আমার হাত ধরে টানতে থাকেন, আরেক হাত দিয়ে টেনে ধরেন নিতুকেও, 'একটা সংসারের সবচেয়ে মুরব্বি মানুষটা অসুস্থ, এই সময়টা সবার এক সাথে থাকা উচিত, তা না—।'

ড্রইংরুমে সবাই এসেছে, কেবল মেজ ভাবি আসে নি। মেঝ ভাইয়া আমাকে দেখে একবার রাগী চোখে তাকিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। বড় ভাইয়া, বড় ভাবি নির্ভারভাবে বসে আছে, মেজ আপা বরাবরের মতো উদাস, বড় আপাকে দেখে তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

দুলাভাই মেঝ ভাবিকে নিয়ে ড্রইংরুমে এলেন। তারপর তাকে বসতে বললেন একটা সোফাতে, বসলেন না মেঝ ভাবি। দুলা ভাই কোনার সোফাটাতে বসে খুক করে একটু কাশি দিয়ে বললেন, 'মার অবস্থা তেমন ভালো না। এরই মধ্যে সকালে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। আমি সবার কাছে বিশেষ করে মেজ ভাবির কাছে হাত জোড় করে মাফ চাচ্ছি।'

বড় আপা চিৎকার করে উঠে বলে, 'তুমি মাফ চাইবে কেন, তুমি দোষ করেছ নাকি ?'

হাত দিয়ে ইশারা করে বড় আপাকে থামিয়ে দিয়ে দুলাভাই বলেন, 'অনি ছোট মানুষ, ওর পক্ষ থেকে আমিই ক্ষমা চাচ্ছি।' দুলা ভাই মেজ ভাবির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মেঝ ভাবি, যদিও ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার মতো না। তবু আপনার কাছে অনুরোধ ব্যাপারটা আপনি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং ক্ষমা করবেন ওকে।'

মেজ ভাইয়া হঠাৎ নড়েচড়ে বসে বলেন, 'মা আর এবার বেঁচে থেকে বাড়িতে ফিরবে না, এটা আমরা সবাই জানি।' মেঝ ভাইয়া দুলাভাইয়ের দিকে

তাকিয়ে বলেন, 'ভগ্নিপতি হলেও তুমি আমাদের সংসারেরই একজন। তুমি আজ আছো, একটা বিষয়ে এখনই আমি ফয়সালা করতে চাই। মার যা কিছু আছে তার সবকিছুরই ভাগ বাটোয়ারা করতে চাই, তোমার সামনে থেকেই করতে চাই। মা এক দুদিনের জন্য যা বেঁচে আছে, মা বেঁচে থাকতেই তা করতে চাই এবং এখনই করতে চাই, মা মারা যাওয়ার পর যে কী হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারছি না।'

দুলাভাই লজ্জা মাখা হাসিতে বলেন, 'এটা কি ঠিক হবে ভাইজান, মা এখনো বেঁচে আছেন!'

'ঠিক হবে কি না তা তুমি সবাইকে জিজ্ঞেস করো?'

বড় ভাইয়া কেমন মোচড় দিয়ে সোজা বসেন। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে মাথাটা একটু নিচু করে বলেন, 'আমার ব্যবসাটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, ক্যাশের অভাব। মার ওখান থেকে যদি কিছু টাকা পেতাম, তাহলে ব্যবসাটা ভালো করে দাঁড় করাতে পারতাম। টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পাব ততই উপকার হবে আমার।'

মেজ আপা বড় ভাইয়ার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মার জিনিসের প্রতি ছেলে মেয়ে সবারই অধিকার থাকে। আমি এখানে বসে বসে থাকি, ভালো কিছু টাকা পেলে আমি একটা কিছু শুরু করতে পারি।'

দুলাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বড় আপা একটু ইতস্তত ভাব নিয়ে তাকায়। তারপর কেমন একটা দ্বিধা নিয়ে বলে, 'ও তো সারাদিন ওর ব্যবসা নিয়ে থাকে। আমিও তো বাসায় একা একা থাকি, কিছু টাকা পেলে আমিও একটা কিছু শুরু করতে পারি।'

বড় আপার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকান দুলা ভাই, 'তুমি কী শুরু করতে চাও?'

'টাকা হাতে পেলে তখন সেটা দেখা যাবে।' বড় আপা অন্য দিকে তাকিয়ে বলে।

'ঠিক আছে, একটু পর তোমাকে একটা ব্লাক চেক লিখে দেব আমি, তোমার যত টাকা প্রয়োজন তুমি তা লিখে তুলে নিও ব্যাংক থেকে।' দুলাভাই বড় আপার দিকে অবাক চোখ তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর মেজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ভাইয়া, এবার আপনি বলুন?'

'আমি আর কী বলব।' মেজ ভাইয়া মেঝ ভাবির দিকে একবার তাকিয়ে বলে, 'ও ছোটখাটো একটা বুটিক শপ দিয়েছে, টাকাটা ওর প্রয়োজন, আমার কোনো টাকা-পয়সা লাগবে না।'

সোফায় বসে ছিল নিতু, উঠে দাঁড়ায় ও। দুলাভাই তাই দেখে বলেন, 'তুমি আবার উঠে দাঁড়ালে কেন?

'একটা কথা বলব।'

'কথা বলবে ভালো কথা, কিন্তু বসে বলো।'

নিতু তবুও দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'মা মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয় এটা ঠিক। কিন্তু মার এবারের অসুস্থতার কারণটা ভিন্ন। আমাদের সবারই সে কারণটা একবার জানা উচিত।'

সবাই নিতুর দিকে ফিরে তাকায়, কেবল মেজ ভাইয়া আর মেজ ভাবি মাথা নিচু করে থাকেন। নিতু কিছু বলতে পারে না। সবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোফার ওপর বসে পড়ে ধপাস করে। তারপর লজ্জায় নিজের মুখটা ঢেকে ফেলে দু'হাত দিয়ে।

বাসায় ঢুকেই দেখি ঘটনা সত্য। ফুপাজান অর্ধ নগ্ন হয়ে বাসার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর একটু পর পর চিৎকার করে বলছেন— আমি নাঙ্গা বাবা, আমি নাঙ্গা বাবা। আমাকে দেখেই ফুপাজান তার গামছার মতো পরনের কাপড়টা ঠিক করে বললেন, 'আাসো আসো, অনি আসো।' তারপর বুকের সঙ্গে আমাকে চেপে ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। শেষে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি পানি পড়া নিতে এসেছো, পানির বোতল কই তোমার? না, ফুঁ দিয়া দেব? তোমার সমস্যা কী বলো। আমি এক ফুঁতেই সব সমস্যাকে উড়িয়ে দিচ্ছি।' ফুপাজান আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে তার ঘরে বসালেন।

দ্বিতীয়বারের মতো আমি চমকে উঠলাম। ফুপার সারা ঘর বিভিন্ন রঙিন কাগজের ফুল দিয়ে সাজানো। অনেকগুলো চিকচিকে কাগজের মালা ঝুলছে চারপাশে। লাল গালিচার মতো বিছানো চাদরের দুই পাশে দুটি বড় বড় কোল বালিশ রাখা আছে আজ। বিছানার চাদরটা আজ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, কারণ সারা বিছানা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। সেদিনের চেয়ে আগরবাতি আজ বেশি জ্বালানো হয়েছে, ধোঁয়ার ভরে গেছে সারা ঘর।

বিছানায় উঠে কোলবালিশ দুটো কাছে টেনে নিলেন ফুপাজান। একটাতে কনুই রেখে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসলেন। তারপর আমার দিকে বিশেষ ভঙ্গিমায় তাকিয়ে ইশারা করে বিছানার সামনে সারি করে রাখা একটা আসনে বসতে বললেন। আমি বসলাম।

'তুমি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছে, বাবা?'

'জি, একটু তো অবাক হয়েছিই।'

'অবাক হওয়ার কিছু নেই বাবা। সবই তার ইচ্ছা। আমরা এ দুনিয়াতে আসি ন্যাংটা হয়ে, যাবও ন্যাংটা হয়ে, নাম কা ওয়াস্তে একটা সাদা কাপড় পেঁচানো থাকবে আমাদের সঙ্গে, মাঝখানের এ কয়টা দিন তাই কাপড় পরে কী লাভ বলো ? শুধু ইজ্জত ঢাকার জন্য ছোট্ট একটা কাপড় পড়লেই ব্যস। অবশ্য মেয়েদের জন্য কাপড়টা একটু বেশি লাগবে।'

মাথার ভেতর পাগলামি এসে ভর করল। ফুপাজানের ভণ্ডামি সম্ভবত আমি ধরতে পেরেছি। একজন সাধারণ মানুষ যখন পাগল হওয়ার ভান করে তখন তার পাগলামি ধরা যায়, ফুপাজানেরটাও ধরতে পারলাম আমি। মানুষ পাগল হলে এত তাড়াতাড়ি কখনো পাগল হয় না, ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ফুপাজান পাগল হয়েছেন এক কি দুদিনেই। তাছাড়া সত্যিকারের পাগল হলে ওইটুকু কাপড়ও শরীরে রাখতেন না। ব্যাপারটা ফুপাজানকে বুঝতে দিলাম না আমি। খুব আগ্রহ নিয়ে ফুপাজানের দিকে একটু ঝুঁকে বসে বললাম, 'আপনি অত্যন্ত দামি কথা বলেছেন ফুপাজান।'

'শোনো, তোমাকে আরো কিছু দামি কথা বলি। টাকা চেনো তো ?'

'টাকা! টাকা তো সবাই চেনে।'

'না, টাকা সবাই চেনে না। টাকা যদি সবাই চিনতই তাহলে টাকার পেছনে মানুষ এত পাগলের মতো ছুটত না। টাকা হচ্ছে মানুষের শত্রু।'

'শত্রু!'

'হ্যাঁ, শত্রু। বিশ্বাস হচ্ছে না, না ? ঠিক আছে তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। তোমার যখন অনেক টাকা হবে তখন দুনিয়াতে তোমার কী কী অসুবিধা হবে প্রথমে সেগুলো বলছি। বেশি টাকা হয়ে গেলে তোমার আশপাশের মানুষজন তোমার কাছে হাত পাতবে। তুমি যদি তাদের কোনো টাকা-পয়সা না দাও, তাহলে তারা তোমার বদনাম করবে। বলবে— তুমি ঘুষ খেয়ে টাকা বানিয়েছে, না হলে ডাকাতি করে টাকা বানিয়েছ, আবার হয়তো বলবে তুমি দেশের কোনো স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে টাকার পাহাড় গড়েছ। তারা অলরেডি তোমার শত্রু হয়ে যাবে। এটা তো গেল একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে এতগুলো টাকা ঠিকমতো সংরক্ষণ করার জন্য তোমার মধ্যে সবসময় টেনশন কাজ করবে। এতে তোমার প্রেশার বাড়বে, দুশ্চিন্তা হবে, ফলে ডায়াবেটিস হবে, হার্ট ডিজিস হবে, আরো কত কী! আরো একটা দিক হচ্ছে, বেশি টাকা হয়ে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তার মাঝে অহংকার এসে যায়, গর্ব এসে যায়, অন্য মানুষকে ছোট করে দেখার অভ্যাস এসে যায়। মোটা কথা মানুষ পশুতে পরিণত হয়। কী বুঝলে তুমি ?'

'অনেক কিছু বুঝেছি।'

'এগুলো তো গেল দুনিয়ার হিসাব। আখেরাতের হিসাব আরো কঠিন রে বাবা।' ফুপাজান হঠাৎ চিৎকার কেঁদে ওঠেন। তিনি কাঁদছেন, কিন্তু তার চোখে কোনো পানি নেই, কেবল চেহারাটা বিকৃত করে শব্দ করছেন তিনি। কিছুক্ষণ এভাবে ভণ্ডামি করার পর ফুপাজান আবার বলতে শুরু করেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষ তার সম্পদের হিসাব দিতে দিতে পাগল হয়ে যাবে। ইয়া আল্লা তুমি আমাকে সে বিপদ থেকে রক্ষা কোরো।' ফুপাজান আবার শব্দ করে মুখ বিকৃত করতে থাকেন।

প্রচণ্ড মজা লাগছে আমার। আমি যতদূর জানি, ফুপাজানের এ পরিমাণ টাকা আছে, কোনো ব্যাংকে রেখে সুদ না নিয়ে কেবল খরচ করলেই একশ' বছরেও একটা ফ্যামিলি সে টাকা শেষ করতে পারবে না। অথচ ফুপাজানের গ্রামে তার অনেক গরিব আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের কোনো রকম সাহায্য করেন না তিনি। এমনকি এই বাসায় তাদের অনেকে থাকা তো দূরের কথা ঠিকানাই জানে না।

'তুমি কী এক গ্লাস শরবত খাবে?'

'শরবত?'

'হ্যাঁ, শরবত। আমার নিজের উদ্ভাবিত শরবত। আমি নিজে ফুঁ দিয়ে পবিত্র শরবতটা বানিয়েছি। খাবে নাকি?'

'না, ঠিক খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ভুল করছ বাবা, ভুল। এটা সাধারণ কোনো শরবত না।' ফুপাজান কোল বালিশ পাল্টিয়ে কনুই রাখেন আরেক বালিশে।

'ফুপু কোথায়, ফুপাজান?'

'ও যে আজকাল কোথায় যায় বুঝতে পারি না।'

'আমি তাহলে আজ যাই।'

'যাবে কেন, বসো।' ফুপাজান সোজা হয়ে বসে বলেন, 'তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয় নি।'

'বলুন।'

'আমার কিছু শিষ্য দরকার।

'শিষ্য দিয়ে কী করবেন ফুপাজান?'

'বড় বড় কামেল মানুষদের শিষ্য লাগে। তবে আমার শিষ্যরা হবে অন্যরকম। যারা আমার কথা শুনবে, আমার কথা মানবে, আমাকে সেবা করবে।' ফুপাজান তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকেন।'

'দেখি, আমি কিছু শিষ্য যোগাড় করে দিতে পারি নাকি আপনাকে।'

'পারি মানে কী, করবে, অবশ্যই যোগাড় করবে। শোনো, তোমাকে আরেকটা কথা বলি—।' ফুপাজান পিঠ টানটান করে বলেন, 'অনেকে শিষ্যের কাছ থেকে টাকা নেয়, আমি করব তার উল্টো। আমি শিষ্যদের টাকা দেব। ওরা আমার সেবা করবে, আর আমি দেব ওদের টাকা। একটা কাজ করো না, প্রথম শিষ্যটা তুমিই হয়ে যাও।'

'শিষ্য কীভাবে হব?'

'কিছুই করতে হবে না তোমাকে, শুধু তোমার হাত দিয়ে আমার পা দুটো ছুঁয়ে সে হাত মাথায় ঘষবে, সারা মুখে ঘষবে, তারপর ঠোঁটের সঙ্গে ঠেকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না তোমাকে, আমার শিষ্য হয়ে গেলে তুমি।'

মানুষের মাথা গরম হয়, আমার গরম হয়ে গেল পা থেকে মাথার সবটুকু। ফুপাজান আশাবাদী হয়ে পা দুটো মেলে দিয়েছে। আমিও তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, পা ছুঁতে গিয়ে পা দুটো টেনে বিছানা থেকে নামাব ভণ্ড হারামজাদাকে, তারপর উপর্যুপুরি লাথি। পারলে ওকে ন্যাংটো করে খাঁটি নাঙ্গা বাবা বানিয়ে বেধে রাখব ড্রইংরুমের সোফার সঙ্গে। কিন্তু আমার চিন্তা প্রসারিত হওয়ার আগেই ফুপু হনহন করে ঘরে ঢুকে ফুপাজানকে বলল, 'কোনো কিছু করতে পারলাম না লেমনের বাবা। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই, আগামী সপ্তাহেই দুদক থেকে তোমার নামে চিঠি ইস্যু হচ্ছে।'

ফুপাজান দ্রুত বিছানা থেকে নামলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। আগের মতোই সারা ঘর হাঁটতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন— 'আমি নাঙ্গা বাবা, আমি নাঙ্গা বাবা...।'

'তুমি এটা কী পরে আছো! ঘরে একটা মেয়ে আছে তোমার!'

ফুপাজান কিছু বলে না, কেবল ফুপুর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলেন, 'আমি নাঙ্গা বাবা, আমি নাঙ্গা বাবা।'

'তুমি এসব রাখবে, পুষি না হয় এখন বাইরে আছে, একটু পরেই এসে পড়বে। তারপর তোমাকে এভাবে দেখে ও কী ভাববে চিন্তা করেছ?'

'আমি নাঙ্গা বাবা, আমি নাঙ্গা বাবা।'

'তুমি যদি এখন এসব বন্ধ না করো আমি কিন্তু মানুষ ডেকে আনব।'

ফুপাজান হাঁটতে নিয়েই থমকে দাঁড়ান। ফুপুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগী চোখে তাকিয়ে বলেন, 'যাও, মানুষ ডেকে আনো, সারা এলাকার মানুষ ডেকে আনো। সবাই এসে আমাকে দেখুক। দেখুক, আমি বাসার ভেতর ন্যাংটো হয়ে

থাকি। তারপর সবাই তোমাকে বলবে ন্যাংটা পাগলের বউ। তোমার ভালো লাগবে তা শুনতে ?'

'তুমি তো পাগল হওয়ার ভান করছ আর আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি। তোমার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার বেঁচে থাকার সব সাধ মিটে গেছে লেমনের বাবা।'

ফুপাজান করুণ চোখে ফুপুর দিকে তাকান। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'এখন তো সব সাধ মিটে যাবেই। কারণ তোমার সাধ মেটানোর জন্যই তো আমি এত কিছু করেছি। আমার বাবা-মার খোঁজ নেওয়া বাদ দিয়েছি, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছি, মানুষ থেকে অমানুষ হয়েছি। ভালো—।' ফুপাজান মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'খুব ভালো। আমার এই বিপদের সময় সবাই কেমন পাল্টে যাচ্ছে!' ফুপাজান শব্দ করে হেসে ওঠেন কিন্তু তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে টপটপ করে।

ফুপু তিন কাপ চা বানিয়ে ঘুমের ওষুধ মেশালেন একটা কাপের ভেতর। ফুপাজান সেই কাপের চা-টা খেয়েই তিন-চার মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। খুব যত্ন করে ফুপাজানকে শুইয়ে দিয়ে ফুপু আমাকে ড্রইংরুমে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমার একটা কথা রাখবি তুই ?'

'কী কথা ফুপু ?'

'তার আগে বল রাখবি ?'

দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যাই আমি। ফুপু আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'খুব কঠিন কিছু না। তোর নামে একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেব আমি। সেখানে কিছু টাকা রাখব অমি।'

'আমার একাউন্টে কেন, পুষি কিংবা লেমনের একাউন্টে রাখুন ?'

'ওরা তো তোর ফুপার ছেলে মেয়ে। দুদক যখন চেক করবে তখন সবকিছু বের করে ফেলবে। কিন্তু তুই তো তোর ফুপার রক্তের কেউ না, তাই ধরা পড়ার কোনো ভয় নেই।' ফুপু ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলেন, 'লেমনের কাছ থেকে যে কিছু বুদ্ধি নেব, তারও উপায় নেই। তুই তো জানিস, ও দেশের বাইরে থেকে লেখাপড়া করে বটে, কিন্তু তোর ফুপার কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নেয় না। তোর ফুপার টাকা-পয়সাকে ও খুব ঘৃণা করে। তোর ফুপার সঙ্গে ও কথা বলে না অনেকদিন।'

'আমার ভয় করছে ফুপু।'

'আমি জানি তোর ভয় করবে। কিন্ত কী করব বল ? বাসার কোথাও যে টাকা পয়সা রাখব তার কী কোনো উপায় আছে ! কয়েকদিন আগে এক বন কর্মকর্তা ড্রামের ভেতর, বালিশের ভেতর টাকা রেখেও বাঁচতে পারে নি, ধরা সে পড়েছেই। বাসায় আসলে টাকা লুকানোর কোনো জায়গা নেই রে। রাস্তায় যে ফেলে দেব, সেটা ফেলতেও কষ্ট হয়।'

'ফুপু, পুষি কোথায় ?'

'ও তো বাইরে।'

'সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ও এখনো বাইরে!'

'এক বান্ধবীর বাসায় গেছে, এখনই এসে পড়বে। ভালো কথা, তোর জানা শোনা কোনো কামেল লোক আছে ?'

'আপনি না কি একটা লোকের কথা বলেছিলেন, গাজীপুরে থাকে ?'

'ড্রাইভারকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে, লোকটাকে তেমন সুবিধার মনে হয় নি আমার।'

'আমার মনে হয় লেমনকে এখন সবকিছু জানানো দরকার।'

'কী হবে জানিয়ে, মাঝখান থেকে টেনশন করবে ও। দেশের মাটি ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে দূরে থাকে, কী লাভ ওর কষ্ট বাড়িয়ে !' ফুপু একটু থেমে বলেন, 'কী সিদ্ধান্ত নিলি, তোর নামে একটা একাউন্ট খুলব ?'

ফুপুর মুখের দিকে তাকাই আমি। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলি, 'কত টাকা রাখতে চান আমার অ্যাকাউন্টে ?'

'বেশি না, মাত্র দেড় কোটি টাকা।'

'কত!' বুকের ভেতরটা বন্ধ হয়ে আসতে নেয় আমার। আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। আমার হঠাৎ মনে হয়, টাকা, এত সস্তা, এত সহজে পাওয়া যায় এগুলোকে!

নয়দিন পর হাসপাতাল থেকে মা বাড়িতে এলো। প্রতিবার বাড়িতে আসার সময় মা অন্তত দুটো কাজ করে— এক. মার মুখে প্রশান্তির হাসি থাকে, দুই. কয়েক প্যাকেট টাঙ্গাইলের চমচম থাকে মার হাতে। সেই মিষ্টির প্যাকেটগুলোর যতই ওজন হোক না কেন মা তা নিজ হাতে করে বাড়িতে ঢোকে।

মা এবার বাড়িতে ফেরার সময় এ দুটোর একটাও করল না। মাথা নিচু করে বাড়িতে ঢুকল, মাথা নিচু করেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কোনো দিকেই তাকাল না মা, এমন কি তার প্রিয় হাস্নাহেনা ফুলগাছটার দিকেও তাকাল না একবার চোখ তুলে।

বাবাকে আমরা প্রচণ্ড ভয় পেতাম। বাবা বেঁচে থাকার সময় আমরা তেমন হৈচৈ করতাম না বাড়িতে। সবাই প্রায় চুপচাপই থাকতাম। বাবাও চুপচাপ থাকতেন, প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোনো কথা বলতেন না তিনি। বিয়ের কয়েক বছর পর থেকেই মা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ত, হাসপাতালে যেতে হতো তাকে, কখনো কখনো থাকতেও হতো তাকে সেখানে বেশ কয়েকদিন। সেই কয়টা দিন আমরা খেয়াল করতাম বাবা বাড়িতে আরো নিশ্চুপ হয়ে গেছেন, প্রয়োজনীয় কথাটাও বলছেন না, মাঝে মাঝে দেখতাম বাবা রাতে ঘুমানো বাদ দিয়ে সারা ঘর পায়চারি করছেন। কি একটা দিন বাবা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠতেন। সেদিনটা হলো হাসপাতাল থেকে মার বাড়িতে ফেরার দিন।

নিতু তখন ক্লাস এইটে পড়ে সম্ভবত। সন্ধ্যার দিকে ও আমার ঘরে দৌড়ে এসে বলল, 'ভাইয়া, মা তো আগামীকাল হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসবে। চল না আমরা একটা কাজ করি।'

পড়ছিলাম আমি, টেবিল থেকে চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, 'কী কাজ, বল ?'

ওর হাতের ব্যাকরণ বইটা আমার সামনে মেলে ধরে বলে, 'এখানে একটা মানপত্র আছে। বড় কারো আগমন উপলক্ষে মানপত্র পড়া হয় এবং তাকে সেই মানপত্রটা দেওয়া হয়। আমাদের মা হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। চল না,

কালকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরা উপলক্ষে মাকে একটা মানপত্র দেই আমরা। সঙ্গে সঙ্গে সংবর্ধনাটাও দিয়ে ফেলি— রোগমুক্ত হয়ে মার শুভ বাড়ি ফেরা উপলক্ষে সংবর্ধনা! আইডিয়াটা কেমন বলতো ভাইয়া?'

কিছু বলি না আমি, ভাবতে থাকি। একটু ভেবেই বলি, 'একসেলেন্ট! কিন্তু সংবর্ধনা দিতে হলে তো কিছু জিনিস লাগবে আমাদের।'

নিতু উৎসাহী ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলে, 'কী কী জিনিস লাগবে, বল?'

'যেহেতু আমরা মাকে সংবর্ধনা দেব, সেহেতু মা হচ্ছে আমাদের প্রধান অতিথি। প্রধান অতিথি এলে যেমন তাকে প্রথম ফুলের মালা গলায় দিয়ে রিসিভ করতে হয়, মাকেও তেমনি একটি ফুলের মালা দিতে হবে। প্রধান অতিথি আসন গ্রহণ করলে তাকে তখন মানপত্র পড়ে শোনাতে হবে, সেই মানপত্রটা আবার বাঁধাই করা হতে হয়। সবশেষে তাকে আপ্যায়ন করতে হয় ভালো কিছু খাবার দিয়ে, যেমন মিষ্টি, বিভিন্ন রকমের ফল, চা, কফি কিংবা কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে। এখন তুই-ই বল আমাদের কী কী জিনিস লাগবে?'

'একটা মালা।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'একটা মালা।'

'তারপর কিছু আপেল, কমলা, আর আঙ্গুর। তবে এর সঙ্গে লাল রঙের ডালিমও আনতে হবে। কারণ মা ডালিম খুব পছন্দ করে।'

'মিষ্টি?'

'মিষ্টি তো অবশ্যই। তবে যত মিষ্টিই আনিস না কেন মার পছন্দ রসে ডুবানো সাদা রঙের মিষ্টি।' নিতু একটু উত্তেজনা নিয়ে বলে, 'সবচেয়ে যা জরুরি তা হলো মানপত্রটা লিখে ফেলা এবং সেটা বাঁধাই করে আনা।'

'এত কিছু করতে তো টাকা লাগবে।'

'তা তো লাগবেই।'

'টাকা পাব কোথায়?'

নিতু ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। মনে হচ্ছে আমি যা বলেছি ও তা বুঝতে পারে নি। মাথা চুলকাতে চুলকাতে ও সবশেষে বলল, 'না থাক, মাকে সংবর্ধনা দেওয়ার দরকার নেই।'

'দরকার নেই মানে!' আমি একটু শব্দ করে বলি, 'কী বলছিস তুই?'

'টাকাও নেই সংবর্ধনাও নেই।'

নিতুর একটা হাত চেপে ধরে আমি বলি, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

আতঙ্কিত হওয়ার মতো চোখ করে নিতু বলে, 'কী কাজ?'

'তোকে তো বাবা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, বাবাকে সাহস করে কথাটা বলে দেখ না।'

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে নিতু বলে, 'বাবাকে বলব?'

'বাবাকে না বলা ছাড়া আমাদের আর কাকে বলার আছে বল।'

বাবা শুয়েছিলেন তাঁর ঘরে, নিতু ভীরু ভীরু পায়ে সে ঘরে ঢুকতেই আমিও দ্রুত বাবার ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়ালাম। তারপর নিতু ফিসফিস করে বলার মতো দ্রুত কী যেন বলল বাবাকে, বাবা সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত ধরে ঘরের বাইরে চলে এলেন। তার আগেই আমি আমার ঘরে চলে এলাম।

আমার ঘরে এসে বাবা আমাকে বললেন, 'অনি, তুই কি মানপত্র লিখতে পারবি?'

খুব উৎসাহ নিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

বাবা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একশ' টাকার ছয়টা নোট দিয়ে বললেন, 'যা, সবকিছুর ব্যবস্থা কর, আমি আছি তোদের সঙ্গে।'

মাকে আমরা সেবার সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। মানপত্রটা লিখেছিলাম আমি, পড়েছিল নিতু। সেই মানপত্র শুনে মার সে কী কান্না! আমরা একটু পর খেয়াল করি, আমাদের রাগী বাবাও কাঁদছেন। আমার জীবনে সেই দিনটা ছিল সবচেয়ে আনন্দের দিন, সবচেয়ে সুখের দিন।

বাবা বেঁচে থাকতে মা যে কয়বার হাসাপাতালে গেছে প্রতিবারই বাড়ি ফিরলেই মাকে সংবর্ধনা দিতাম আমরা। একবার আমরা এক মাসে দুবার মাকে সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। মাকে সেই মাসে দুবার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। বাবাও মারা যান, মাকে সংবর্ধনা দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায় আমাদের।

বড় দুলাভাই সন্ধ্যার একটু আগে তিন হাত লম্বা একটা চিতল মাছ, বনস্পতি চাল, সিরাজগঞ্জের দই, আর কী সব এনে বাসায় হাজির। সঙ্গে সঙ্গে দুজন মোটা করে লোককেও নিয়ে এসেছেন। ঘরে ঢুকেই তিনি বড় আপাকে ডেকে বললেন, 'মার সুস্থ হয়ে ফিরে আসা উপলক্ষে আজ রাতে পিকনিক হবে। মা যা যা পছন্দ করেন তার সবই নিয়ে এসেছি। দেখো তো, সবকিছু ঠিক আছে কি না?' দুলাভাই লোক দুজনকে পাশের সোফাতে বসতে বললেন ইশারা করে।

আপা জিনিসপত্রের দিকে না তাকিয়ে বড় দুলাভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত কিছু যে এনেছ, রান্না করবে কে?'

'সেটা তোমার চিন্তা করতে হবে না।'

'আমার চিন্তা করতে হবে না তো কার চিন্তা করতে হবে ?'

'এ বাড়িতে আরো অনেক মানুষ আছে।'

আপা রাগ করে চলে গেল। দুলাভাই নিতুকে ডেকে সোফায় বসা দুজনকে দেখিয়ে বললেন, 'এনাদের রান্নাঘরটা দেখিয়ে দাও। এনারা খুব ভালো রান্না করেন, আজ এনারা রান্না করবেন।'

'এনারা কেন ?' নিতু জিজ্ঞেস করে।

'আজ এই আনন্দ দিনে আমরা সবাই মিলে মার সঙ্গে গল্প করব। আমাদের কেউ রান্না করলে তো গল্প করার সুযোগ পাবে না, তাই এনাদের আনা হয়েছে।' দুলাভাই নিজেই জিনিসপত্রগুলো হাতে নিয়ে বললেন, 'চলুন, রান্নাঘরটা দেখিয়ে দেই আপনাদের।'

লোক দুজন রান্না শুরু করেন। দুলাভাই হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে সবাইকে মার ঘরে চলে আসতে বলেন। আমি আর নিতু চলে আসি সঙ্গে সঙ্গে। মা আমাদের দেখে বিছানা থেকে উঠে বসে বলে, 'তোরা একটু আমার কাছে এসে বোস।' আমরা কাছে বসতেই মা আবার বলে, 'তোদের চেহারা-সুরত এমন হয়ে গেছে কেন ? ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করিস নি নাকি! কাল তোর বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি।'

'বাবাকে আমিও স্বপ্নে দেখেছি।' নিতু মার কাঁধে মাথা রেখে বলে।

'কী দেখেছিস ?' মা খুব উৎসাহী হয়ে বলে।

'বাবা একটা গাছের নিচে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।'

'অ আল্লা, তাই নাকি, আমিও তো এই স্বপ্নটাই দেখেছি।' মা একটু হেসে বলে, 'বেচারা রেগে থাকত কিন্তু আমাকে ছাড়া চলতে পারত না একটুও, কেমন যে আছে!' মা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'আমার সবচেয়ে বড় ভাগ্য কী জানিস ? তোর বাবার মতো একটা স্বামী পেয়েছিলাম আমি। প্রতিদিন কত কিছু যে শিখেছি তাঁর কাছে। রেগে রেগে কথা বলতেন আর এটা ওটা শেখাতেন। আর পেয়েছি তোদের মতো দুটো ছেলে মেয়ে। আরো একজনকে পেয়েছি আমি, সেটা হচ্ছে তোর বড় দুলাভাই। কোন মায়ের সন্তান আর কোন মায়ের জন্য পাগল! আমি প্রতিদিন ওর কথা মনে করি আর কাঁদি।'

বড় দুলাভাইয়ের কথা বলতে বলতেই দুলাভাই এসে হাজির, 'আর কেউ আসে নি ?'

নিতু বলল, 'না।'

'সবাইকে না আসতে বললাম!'

'সবাইকে বললেই সবাই আসবে! মা বাড়িতে ঢোকার পর সবাই নাম মাত্র মাকে দেখে গেছে, একটু বসেও নি, জিজ্ঞেসও করে নি, মা কেমন আছো তুমি, কেমন লাগছে এখন তোমার।'

'মেজ ভাবি এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ভাইয়ার সঙ্গে এসেছিল।'

'ঠিক আছে, আর কারো দরকার নেই, আমরা মিলেই গল্প করি।' বড় দুলাভাই নিতুকে বলেন, 'নিতু, তুমি একটু বাইরে যাও তো আপু।' তারপর হাসতে হাসতে বলেন, 'আমরা এখন যে গল্প করব, সেই গল্পের মাঝে তুমি না থাকলেও চলবে।'

নিতু কিছু একটা বুঝতে পারে। তারপর লাজুক মুখে নিঃশব্দে বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

দুলাভাই মার পাশে বিছানায় বসে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকেন। একটু পর মাথা তুলে মার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মা, নিতুর জন্য একটা ভালো ছেলের খোঁজ পেয়েছি আমি। ছেলে খুবই ভালো ছাত্র, অবস্থাও ভালো। কিন্তু ছেলের খুব শখ সে বিদেশে গিয়ে একটা ডিগ্রি নেবে।'

'ডিগ্রি নেবে তো ভালো কথা।'

'কিন্তু বর্তমানে ওদের একটু অসুবিধা যাচ্ছে। তাই আমি ভেবেছি, নিতুও যেহেতু ভালো ছাত্রী, বিয়ের পর ওই ছেলের সঙ্গে নিতুকেও বিদেশে পাঠিয়ে দেব।'

'নিতুর বিয়ের জন্য তোমার বাবা বেশ কিছু টাকা রেখে গেছেন।'

'বাবা যা রেখে গেছেন, তা দিয়ে বিয়েটা ভালোভাবে হয়ে যাবে। কিন্তু দুজনকে বিদেশে পাঠাতে গেলে বেশ কিছু টাকা লাগবে। আপনি ওটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। ওসব আমি দেখব।'

'না, তুমি দেখবে কেন? তোমার বাবা আমার নামে অনেকগুলো টাকা ফিক্সড করে গেছে। তিন ব্যাংকে তিনটা ফিক্সড আছে আমার। তুমি তো জানো ওই টাকার ইন্টারেস্ট দিয়েই সবকিছু করি আমি। এক ব্যাংকের ফিক্সড ভেঙে ফেললেও আমার বেশ ভালো চলে যাবে, এমন কি অনির খরচটাও চালিয়ে নিতে পারব আমি। যদিও আমার খুব ইচ্ছে সব ব্যাংকের ফিক্সডই ভেঙে ফেলার।'

'না, মা আপনি ওটা করতে যাবেন না। আমি যতদিন আছি অন্তত ততদিন না। তাহলে আমি কিন্তু খুব কষ্ট পাব। নিতু আর কেউ না, আমার বোন, ওকে আমি নিজের আপন বোনই মনে করি মা।'

মা ঝিম মেরে বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ পর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'অনি, বাবা তুই একটু বাইরে যা তো, আমি একটু তোর ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলি।'

দুই ঘণ্টা পর দুলাভাই মার ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে বলেন, 'অনি, কাল কিংবা পরশু আমি চলে যাব। একটা দায়িত্ব দিয়ে যাব তোমাকে।'

'বলুন, কী করতে হবে আমাকে?'

'মার দিকে খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে, এমন কি রাতেও মার ঘরে গিয়ে মাকে একটু দেখে আসবে। ভুল যেন না হয়।'

মাঝরাতের দিকে দরজায় টোকার শব্দ শুনেই লাফ দিয়ে উঠলাম আমি। দরজা খুলে বললাম, 'কে?'

বারান্দার মোটা পিলারের আড়াল থেকে মা বের হয়ে বলল, 'আমি। স্যরি বাবা, এত রাতে তোকে ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।' মা আমার সামনে এসে আমার একটা হাত ধরে বলে, 'তুই কি আমার ঘরে একটু আসবি?'

মার ঘরে গিয়ে দেখি নিতুও এসেছে। মা ঘরের লাইটটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, 'তোরা দুজন আমার দুপাশে একটু শুয়ে থাকতো দেখি। আজ রাত তোদের পাশে আমি একটু ঘুমাব।'

আমাদের দুজনকে দুপাশে শুইয়ে দিয়ে মাঝখানে শুয়ে পড়ে মা। তারপর আমাদের জড়িয়ে ধরে বলে, 'একটা গল্প বল তো তোরা, যে গল্প শুনে আমার হাসি আর থামতে চাইবে না। আমি কেবল হাসতেই থাকব, হাসতেই থাকব।' মাঝরাতের নিঃশব্দতাকে খানখান করে দিয়ে মা শব্দ করে হেসে ওঠে। মার অনেক হাসি দেখেছি আমরা, এরকম হাসি কখনো দেখি নি। নিতু মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'মা, এরকম করছ কেন তুমি?' মা কিছুই বলে না, হাসতেই থাকে।

খুব সকালে নিতু আমার ঘরে এসে বলল, 'এই নে, লেমন ভাইয়া তোর কাছে ফোন করেছে ?'

'এত সকালে!'

'এখানে তো সকাল, ওখানে তো এখন দুপুর।'

'এটা কার মোবাইল ?'

'বড় ভাইয়ার।'

মোবাইলটা হাতে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে লেমন বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'স্যরি অনি, তুই বোধহয় ঘুমাচ্ছিলি!'

'না না, ঠিক আছে। কী ব্যাপার তুই এত সকালে-।'

কথা শেষ করতে দেয় না লেমন, 'তুই কি এখনই একটু আমাদের বাসায় যেতে পারবি ?'

বিছানায় উঠে বসি আমি। চোখ থেকে ঘুম এখনো কাটে নি। চোখ দুটো ডলতে ডলতে বলি, 'কেন, কোনো সমস্যা ?'

'আম্মু একটু আগে ফোন দিয়েছিল। কোনো কিছু তো বলল না, শুধু কাঁদছিল। আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না। তুই কি একটু যাবি ?'

'হ্যাঁ যাচ্ছি।' আমি একটু থেমে বলি, 'তোকে একটা কথা বলব ?'

'বল।'

'ফুপাজান, ফুপু সবার সঙ্গে তুই স্বাভাবিক হয়ে যা। তাদের সঙ্গে টেলিফোনে ঘনঘন একটু কথা বল, এটা ওটা জিজ্ঞেস কর। তোর কথাও কিছু বল। তুই কীভাবে লেখাপড়া করছিস, কীভাবে খাওয়া দাওয়া করছিস, সবকিছু শেয়ার কর। কী হবে এভাবে রাগ করে থেকে, বল, রাগ করে থেকে কোনো লাভ আছে?' আমি লেমনকে বুঝাই, ওপাশ থেকে ও কেবল ঘনঘন শ্বাস ছাড়ে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর লেমন খুব হতাশ গলায় বলে, 'বাবার আচরণকে আমি কখনোই মানতে পারি নি। আমি দেখতাম বাবা প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরতেন টাকার বড় বড় প্যাকেট হাতে নিয়ে। কোথা থেকে আসত এ

টাকাগুলো ? বাবার নিশ্চয় টাকার মেশিন ছিল না। বাবা প্রতিদিন এত অবৈধ টাকা ইনকাম করত, অথচ বাবা তার গরিব আত্মীয়স্বজনদের একটুও সাহায্য করত না। মাকেও দেখতাম বাবার পরিবারের লোকদের প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করতে। আমাদের ফ্যামিলিটা একেবারে অসুস্থ রে। বিদেশে এসে পড়ার এটাও একটা কারণ। আমি দেশে থাকলে ওসব দেখতে দেখতে পাগল হয়ে যেতাম। তুই তো জানিস, প্রথম প্রথম বাবা টাকা পাঠাত, পরে টাকা পাঠাতে নিষেধ করেছি। বাবার টাকা নিতে বেশ ঘৃণা হয় আমার।'

'তবু বাবা তো।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে লেমন ফোনের ওপাশে, এপাশ থেকে বোঝা যায় সেই দীর্ঘশ্বাসে কত বেদনা, কত কষ্ট, কত হতাশা।

পুষিদের বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ফুপু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমার সর্বনাশ হয়েছে রে অনি, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

ফুপুর উদ্বিগ্নতা দেখে আমি চমকে উঠি, ফুপাজান আত্মহত্যা করেছে নাকি! ফুপুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'কী হয়েছে ফুপু, কোনো সমস্যা ?'

'কী হয়েছে তোকে আমি তা বলতে পারব না। আমাকে তুই জিজ্ঞেস করিস না।' ফুপু শব্দ করে কাঁদতে থাকেন।

'ফুপাজানের কি কিছু হয়েছে ?'

'তোর ফুপাজানের হওয়ার আর কি বাকি আছে, তার যা হওয়ার সবই হয়েছে। সে তো এখন আর মানুষ নাই।'

'রাইট, একদম রাইট।' ফুপাজান দুলতে দুলতে এ ঘরে এসে বলেন, 'আমি এখন মানুষ নই, অমানুষও নই, মহামানুষ!' ফুপাজান আমার কাঁধে ছোট্ট করে একটা ধাক্কা দিয়ে বলে, 'কি আমি ঠিক বলেছি, না অঠিক বলেছি। যদি অঠিক বলি তাহলে আমার গালে ঠাস ঠাস করে দুটো, না না দুটো না, দুটো দুটো চারটে থাপ্পড় মারবে। কি মারতে পারবে তো ? ভালো কথা—।' ফুপাজান কেমন যেন কাত হয়ে যেতে যেতে বলেন, 'তুমি গুনতে জানো তো। চারটে মারতে গিয়ে আবার পাঁচটা মারবে না তো। তাহলে কিন্তু খুব ব্যথা পাব আমি, বুঝেছ ?'

ফুপু ফুপাজানের একটা হাত ধরে বলেন, 'তুমি ঘরে যাও তো।'

হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে এনে ফুপাজান বলেন, 'ঘরে যাব মানে কী, আমি তো ঘরেই আছি, নাকি ফুটবল খেলার মাঠে আছি। বাবা অনি, তুমিই বলো আমি এখন কোথায় আছি ? সত্যি করে বলবে কিন্তু, একদম মিথ্যা বলবে না। মিথ্যা বললে পিট্টি দেব কিন্তু।'

'এসব ছাইপাশ গিলে গিলেই তুমি শেষ হলে!'

'কী বললে ছাইপাশ!' ফুপা তার হাতের বোতলের দিকে একবার তাকিয়ে ফুপুর দিকে ফিরে বলেন, 'জানো, এরকম একটা বোতল যোগাড় করতে এখন কত কষ্ট হয়। আগে টাকা বের করলেই সুড়সুড় করে এগুলো চলে আসত। এখন টাকা নিয়ে বসে থাকো, ধরনা দাও, পাবে না। যদিওবা পাবে দুই নম্বর। দেশটা দুই নম্বরে ভরে গেছে। বহুত কষ্ট লাগে। শালার জীবন!'

'ঘরে যাও তো, আবোলতাবোল বকছ তুমি।'

ফুপাজান হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'জানো, জরুরি আইন আসার পর থেকেই সবকিছুই কেমন যেন পাল্টে গেল। ভালো করে একটু টাকা-পয়সা ইনকাম করব, ইচ্ছে মতো যে সেগুলো খরচ করব, তার উপায় নেই। আচ্ছা, তুমি বলো—।' ফুপাজান প্রচণ্ড শব্দে একটা ঢেকুর তুলে বলেন, 'যদি প্রতিটা মানুষ তার ইচ্ছে মতো টাকা পয়সা রোজগার করে, রাতারাতি সে ধনী হয়ে যায়, তাহলে তো দেশেরই লাভ। দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে, বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হবে দেশে, বিদেশীরা আমাদের তখন আর বলতে পারবে না মিসকিনের জাত। কী, আমি কি ঠিক বললাম?'

'তুমি ঘরে যাবে, না চিৎকার করে মানুষ ডাকব আমি!'

'কী! আমার বাসার ভেতর তুমি মানুষ ডাকবে। কোন শুয়রের বাচ্চার সাহস আছে আমার বাসায় ঢোকে, পিটিয়ে তার পিঠের চামড়া তুলে ফেলব না আমি। এটা আমার বাড়ি, আমি টাকা খরচ করে এটা বানিয়েছি।'

ফুপু এবার রাগে কাঁপতে থাকেন। তাই দেখে ভয় পেয়ে যান ফুপাজান। দ্রুত তিনি ফুপুর দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'তুমি ওভাবে কাঁপছ কেন।' ফুপাজান আমার দিকে তাকান, 'ও বাবা অনি, তোমার ফুপু ওভাবে কাঁপছে কেন! তাকে থামতে বলো, আমার তো ভয় করে! ভয়ে কিন্তু আমি হিসু করে ফেলব।'

কিছু বলেন না আর ফুপাজান। দুলতে দুলতে ঘরের দিকে চলে যান। আমি ফুপুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি, 'কিছু বুঝতে পারছি না ফুপু। আপনি বললেন আপনার সর্বনাশ হয়ে গেছে, কী হয়েছে খুলে বলুন না।'

'লেমন তোকে ফোন করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে কিছু বলেছে?'

'তেমন কিছু তো বলল না।'

ফুপু একটু দম নিয়ে খুব শান্ত স্বরে বলেন, 'পুষি চলে গেছে।'

আমিও খুব স্বাভাবিক গলায় বলি, 'কোথায় ?'

'জানি না। কাল মাঝরাতের দিকে ফোন করে বলে, আমি আর ও বাসায় আসছি না মা। তবে আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। ভালো একটা ছেলেকে বিয়ে করেছি। সম্ভবত কয়েকদিনের মধ্যে বিদেশে চলে যাব আমরা।'

'কাকে বিয়ে করেছে ও ?'

'সেটা তো বলে নি।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নি ?'

'করেছিলাম, কিন্তু বলে নি।'

'যে যাবার সে যাবেই।' ফুপাজান আবার এ ঘরে এসেছেন, 'মানুষ এ পৃথিবীতে আসেই যাবার জন্য। সুতরাং কেউ চলে গেলে তার জন্য মন খারাপ করতে নেই। এই যে আমি কি মন খারাপ করেছি ? আমার একমাত্র মেয়ে আমাকে ছেড়ে গেল, একমাত্র ছেলেটাও যাওয়ার মতো, আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমার সঙ্গে যোগযোগ করে না, আমার টাকা-পয়সা নেয় না, কই আমি কি কিছু বলেছি ? ওদের জন্য এই যে আমি এত কিছু করলাম, ওরা তা প্রত্যাখান করে চলে গেল, আমার তো একটুও কষ্ট লাগছে না। ওরা যা ভালো মনে করেছে তাই করেছে। তার জন্য আমি বসে বসে কাঁদব নাকি ?' ফুপাজান বলছেন বটে, কিন্তু তার চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। তিনি বারবার হাত দিয়ে সেই চোখের পানি মোছার চেষ্টা করছেন, পানি আরো জোরে জোরে গড়িয়ে পড়ছে চোখ থেকে।

বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে আমার। পুষি চলে গেছে! আচ্ছা, ও কি আমার কেউ ছিল? মায়াবী জ্যোৎস্নার মতো ও কি আর আমার ঘরে ঢুকে বলবে না— তুমি কী বলো তো, আমাকে একটুও বুঝতে পারো না তুমি! ওর গভীর নিঃশ্বাসে আমার ঘাড়ের রোমগুলো কি আর কেঁপে কেঁপে উঠবে না ? হায়, চলে যাওয়ার পরই কেবল চলে যাওয়া মানুষটার আসন বুকের ভেতর এত শক্ত হয়, মানুষ সেজন্যই চলে যায় ? কারণ-অকারণে ?

মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছি গুটিসুটি হয়ে। মা আমার মাথার চুলগুলোতে বিলি কাটছে আর কি একটা দোয়া পরে ফুঁ দিচ্ছে। দু-তিনবার ফুঁ দেয় আর মা জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোর ?'

আমি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলি, 'কিছু না, কিছু না।'

নিতুর প্রচণ্ড চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় আমার। দড়াম করে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা। বিছানা থেকে উঠে মেঝেতে পা রাখতেই ও দৌড়ে এসে আমার বুকের ওপর আছড়ে পরে বলে, 'ভাইয়া, মা আর নেই।'

সমস্ত শরীর কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে যায় আমার। স্থির হয়ে যায় আমার সামনেরও সবকিছু— দেওয়াল ঘড়ির কাটা, অল্প অল্প নড়তে থাকা দরজা-জানালার পর্দা, একটু পর পর বাতাসে নড়ে শব্দ করা চাইম বেল, ছাদের কোনায় ঝুলানো হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে ওঠা ছোট ঝাড়বাতিটা। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা মার প্রিয় হাস্নাহেনার ছোট পাতাগুলোও স্থির হয়ে যায়, স্থির হয়ে যায় সেই গাছে বসে শিস বাজানো দোয়েল, নেচে নেচে পোকা খুঁজে বেড়ানো টুনটুনি, এ ফুল থেকে ও ফুলে ঘুরে বেড়ানো প্রজাপতি। আমার সমস্ত পৃথিবীটাই থেমে যায় মুহূর্তে, এক নিমিষে। মার যে হাতটা আমার চুলে বিলি কাটছিল গতরাতে, যে চোখ দুটো আমার মাঝে সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তার কোলে মাথা রাখার সময়, সেগুলোও স্থির। মাত্র বারো ঘণ্টা! এর মাঝেই কেউ একজন চলে গেছে, কেউ একজন নেই— কী অবিশ্বাস্য এই না থাকা, কী নিদারুণ এই চলে যাওয়া!

বড় ভাবিকে নিয়ে মার একটা কষ্ট ছিল। বড় ভাবি বাচ্চা নিতে চাইতেন না। ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে বলে বাচ্চা নেওয়ার প্রতি অনীহা ছিল তার। মা এ নিয়ে খুব কষ্ট পেত।

বিয়ের সাত বছর পর ভাবি যখন বাচ্চা নিতে চাইলেন, ততদিনে ভাবির বাচ্চা নেওয়ার ক্ষমতা চলে গেছে। মা যেদিন এ কথাটা শুনতে পেয়েছিল, সেদিন সারাদিন না খেয়ে থেকেছিল মা। তারপরও মা অনেক চেষ্টা করেছে। আজ এ ডাক্তার কাল সে ডাক্তার। কখনো কবিরাজি, হোমিপ্যাথি, এমন কি অনেক হুজুরের কাছ থেকে পানি পড়াও আনা হয়েছিল।

মা দাদি হতে পারছে না, এতে মা যতটুকু কষ্ট পেত; ভাবি মা হতে পারছেন না, তাতে তিনি কিন্তু কষ্ট পেতেন না একটুও। অন্তত ভাবিকে দেখে তাই বোঝা যেত। বংশের প্রথম ছেলের কোনো সন্তান হচ্ছে না, ফ্যামিলিতে কোনো নতুন সদস্য আসছে না, এই চিন্তায় অনেক রাত না ঘুমিয়ে থেকেছে মা।

কী একটা কারণে মা ছোট ভাবিকে খুব ভালোবাসত। ভাবির পেটে যখন বাচ্চা আসে, তখন মার খুশি দেখে কে! ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় নাই কেবল পেটে এসেছে, তাতেই আশপাশের সবার বাড়িতে মিষ্টি পাঠানো সারা।

পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ছোট ভাবিকে মা তো কোনো কাজ করতে দিতই না, সারাক্ষণ বসিয়ে বসিয়ে রাখত আর একটু পর পর বলত, 'ছোট বউ, কিছু খেতে ইচ্ছে করছে তোমার ?'

মাথা উঁচু নিচু করতেন ছোট ভাবি।

মা ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে বলত, 'কী খেতে ইচ্ছে করছে বউ মা ?'

ভাবি হাসতে হাসতে বলত, 'সেটাই বুঝতে পারছি না মা।'

মা তখন তার সাধ্য মতো সব খাবার এনে হাজির করত ভাবির সামনে। সেখান থেকে ভাবি তার পছন্দ মতো খাবার খেত টুকটুক করে, একেবারে রাজরাণীর মতো।

ভাবির বাচ্চা হওয়ার দিন মা সারাদিন জায়নামাজে বসে থেকেছে আর নামাজ পড়েছে। কত শ রাকাত যেন নফল নামাজ শেষ করে মা শেষে নাতির মুখ দেখে। পরের দিন সারা পাড়ায় মিষ্টি আর গরিবদের গরুর মাংস আর ভাত।

ভাবির সঙ্গে মার সম্পর্ক খারাপ হয় যখন নিলয়কে একটা আবাসিক স্কুলে পাঠানো হয়। নিলয়ের বয়স তখন সাড়ে চার, এ বয়স থেকেই এখানে ভর্তি হতে হয়, এর বড় হলে ভর্তি করানো যায় না।

মার ভীষণ আপত্তি স্বত্বেও নিলয় যেদিন এ বাড়ির বাইরে পা রাখল, তারপর থেকে মা একদম চুপ হয়ে যায় এবং সপ্তাহখানেক পরেই মা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আমাদের ভয়াবহ জেদি মা তারপর থেকে ভাবির সঙ্গে তেমন কথাই বলত না। তবে ভাবিকে যে তখনও অনেক ভালোবাসত তা টের পেতাম আমরা। ভাবি এ সুযোগটাই নেয় কয়েকদিন আগে। সেদিন কোথায় যেন গিয়েছিল মা। মার নিজস্ব সম্পদ ভরা আলমারির চাবিটা মা সবসময় তোষকের নিচে রাখত, সেদিনও ছিল। মার অবর্তমানে ভাবি মার ঘরে যায়। তারপর আলমারিটা খুলে বেশ কিছু সোনার গয়না বের করে যেই না নিজের ঘরে আসছিল, ঠিক তখনই মা ঢোকে ঘরে। ভাবির প্রতি মার বিশ্বাসের খোদাই করা চোখ দুটো হঠাৎ লাল হয়ে যায়, সেই চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে, আস্তে আস্তে মা বসে পড়ে মেঝেতে। তারপর হাসপাতাল। এবং সেই হাসপাতালে নয়দিন থেকে বাড়ি ফিরে মা অবশেষে চলে যায় না ফেরার দেশে।

হাসপাতালে থাকার সময় মামা মাকে একবার একা একাই দেখতে গিয়েছিল, ওই যে সেদিন, যেদিন সকালে হাঁটার নাম করে মামা বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন, আর ফিরে আসেন নি বাড়িতে। হাসপাতালে মার সঙ্গে অনেক কথা বলার পর

মামা একটা চিঠি গুজে দিয়েছিলেন মার হাতে। তারপর এক মুহূর্ত দেরি না করে চলে এসেছিলেন তিনি।

মামার সেই চিঠিতে সব লেখা ছিল, সেদিনের মিটিংয়ের কথা, মার মৃত্যুর আগেই তার সম্পদ ভাগাভাগির কথা। চিঠিটা আমি মার বিছানার নিচে পেয়েছি। আরো কয়েকটা জিনিস পেয়েছি আমি।

প্রচণ্ড বৃষ্টি ভালোবাসত মা। বৃষ্টি এলেই মা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত সেই বৃষ্টির দিকে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসত, মার সারা মুখ ভিজে যেত, তবুও দাঁড়িয়ে থাকত মা। কোনো কোনো দিন ছাট না এলে মা বাচ্চা মেয়ের মতো হাত বাড়িয়ে দিত জানালা দিয়ে, বৃষ্টির পানি ছুঁয়ে সেই পানি মুখে মাখত। মাঝে মাঝে কেমন যেন লাফিয়ে উঠত আনন্দে।

মা মাঝে মাঝে পাগলামিও করত। মার যখন বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করত তখন কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। হয়তো রান্না করছে মা, ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি এলো, রান্না বাদ। মা আমাদের ঘরে এসে ছোটকালে কিছু চুরি করে খাওয়ার মতো ফিসফিস করে বলত, 'অনি, নিতু, বৃষ্টিতে ভিজবি ?'

পরের দিন আমাদের পরীক্ষা থাক কিংবা সে সময় আমরা স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যাচ্ছিলাম অথবা মজার কোনো খেলা করছিলাম আমরা, যত কিছুই করি না কেন, আমরা মার সঙ্গে এসে যোগ দিতাম। আমাদের বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট উঠোন ছিল, সেই জায়গাটা যদিও এখন খালি নেই, একটা ঘর উঠানো হয়েছে সেখানে, সেই উঠোনে মা, আমি আর নিতু মিলে ভিজতাম, কাদার মাঝে লাফালাফিও করতাম। কখনো কখনো খেয়াল করে দেখতাম, মা-ও আমাদের সঙ্গে লাফাচ্ছে আর আমাদের মতোই খিলখিল করে হাসছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ঘটেছিল একদিন, কয়েক বছর আগে। তখন রাত। ছাদের ওপর কেমন যেন ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছিল। আমি তো ভয়ে অস্থির। নিতু ওর ঘর থেকে আমার ঘরে এসে বলল, 'ভাইয়া, ছাদে কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছিস ?'

ভয় ভয় গলায় আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তো ভয়ে অস্থির।'

নিতু আমার হাত ধরে বলল, 'আয়।'

আমি আগের চেয়ে ভয় ভয় গলায় বললাম, 'কোথায় ?'

'আয় না।' নিতু আমার হাত টানতে থাকে।

বুকের ভেতর ধুক ধুক করছে আমার। ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দার মোটা পিলারের আড়ালে দাঁড়ায় নিতু, তারপর ইশারা করে আমাকে ছাদের দিকে তাকাতে বলে। এখান থেকে ছাদের একটা অংশ দেখা যায়। বৃষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার অন্ধকার ছাদটা। পাশের বাসার বাথরুমে জ্বালিয়ে রাখা লাইটের কিছু আলো এসে পড়েছে আমাদের ছাদে। আমি সেই আলোতে দেখতে পেলাম মা বৃষ্টিতে

ভিজছে। আমি নিতুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এত রাতে মা একা ?'

আমার মাথাটা ধরে নিতু আবার সেটা ঘুরিয়ে দিল ছাদের দিকে। মার পাশে এখন বাবাকে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে অনেককিছু দেখে অবাক হয়েছি, কিন্তু সেদিনের মতো হই নি। আমি আবার নিতুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বাবা! এটা কী করে সম্ভব!'

'সম্ভব।' নিতু হাসতে হাসতে আমাকে টেনে আবার ঘরে ফিরে এনে বলে, 'সবার মাঝেই কম বেশি থাকে রোমান্টিকতা, আর সেটা থাকে বলেই মাঝে মাঝে সেটা বেরিয়ে আসে।' নিতু হাসতেই থাকে, 'রোমান্টিকতা তোর মাঝে আছে, পুষির মাঝে আছে, পাশের বাসার কাজের মেয়েটার মাঝেও আছে।' নিতু একটু থেমে বলে, 'এমনকি আমার মাঝেও।'

মাকে কাফনে জড়িয়ে কবরে নিয়ে যাওয়ার জন্য শুইয়ে রাখা হয়েছে খাটিয়াতে। একটু পর মাকে নিয়ে যাওয়া হবে। এ মুহূর্তটাই এ বাড়িতে মার শেষ থাকা। মা আর কখনো ফিরে আসবে এ বাড়িতে। আসবে না ? আসবে না! বুকের ভেতরটা গরম হতে শুরু করে আমার, মাথার ভেতরটাও। আমার প্রথম পাগলামিটা শুরু হয় মাকে যেদিন আমি প্রথম কাঁদতে দেখি। মার কোনো কিছু হলেই আমি কেমন যেন হয়ে যাই। নিতু ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়। ও আমার হাত চেপে ধরে, আকুল চোখে আমার দিকে তাকায়, মাথা এদিক ওদিক করে কোনো কিছু করতে নিষেধ করে।

বারান্দায় বসে আছি আমরা। মা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, 'দেখিস, আমার মৃত্যুর দিন বৃষ্টি হবে, ঝুম বৃষ্টি।' আমরা এখন সেই বৃষ্টির জন্য বসে আছি। বৃষ্টি হবে, ছাদ বেয়ে পানি গড়াবে, সেই গড়ানো পানিতে ভেসে যাবে আমাদের লোভ, আমাদের কপটতা, আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের নির্লজ্জতা। সঙ্গে আরো কয়েকটা জিনিস ভাসিয়ে দেব আমি, যে জিনিসগুলো মার বিছানার নিচে পেয়েছি, যেগুলো আমার হাতের মুঠোয় আছে এখন।

হাতের মুঠোটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলি আমি— একটা লিস্ট, মা লিখে গেছে তার সমস্ত সম্পদের কে কত অংশ পাবে, আর রেখে গেছে একটা ওষুধের তেইশটা খোসা, যে ওষুধ একসঙ্গে দশটা খেলেই সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কী লাভ এসব রেখে! মানুষ নেই, তার সম্পদের বন্টনের লিস্টের আর কী দরকার, মৃত্যুর আগেই যা বণ্টন করতে যাচ্ছিল লোভী মানুষগুলো!

মানুষের সব নিষ্ঠুরতাকে পেছনে ফেলে মা চলে যাচ্ছে, একা, একদম একা। আমরা তখনো বসে আছি। কেবল বৃষ্টির জন্য। আমাদের সমস্ত আকুলতা নিয়ে বসে আছি আমরা, এ অপবিত্র পৃথিবীতে সেই পবিত্র বৃষ্টি আসবেই। সমর্পণ আর উৎসর্গের বিহ্বলতাময় সে বৃষ্টিতে আমরা আজ সারা রাত ভিজব।